বনফুল

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স । কলিকাতা-বারো ॥

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৫২

তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫৭

চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৫৯

পঞ্চম মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৬২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

মুদ্রাকর—হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস

১৮৬।১ আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা ৪

তিন টাকা

এই গ্রন্থখানি
আমার পূজনীয়া জননীর
শ্রীচরণে
উৎসর্গ করিয়া
কৃতার্থ হইলাম

নিবেদন

এই আখ্যায়িকার প্রধান চরিত্র-চতুষ্টয়কে অবলম্বন করিয়া প্রথমে আমি একটি ছোট গল্প রচনা করিয়াছিলাম। পাণ্ডুলিপি অবস্থায় গল্পটি শুনিয়া আমার প্রতিবেশী ও শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (ভাগলপুরের স্বনামধন্য পটলবাবু) গল্পটিকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার কথামতই এই উপন্যাসটি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই।

সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

দুইজন সাহিত্যিক বন্ধুর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। 'দ্বৈরথ' নামটি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া। ইনি এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস পাণ্ডুলিপি অবস্থায় উপন্যাসটি আদ্যন্ত ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ইহার উৎকর্ষ-সাধনকল্পে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বন্ধুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট সঙ্গীতগুলি আমি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত সঙ্গীত-সংগ্রহ পুস্তক হইতে আহরণ করিয়াছি এবং সেজন্য তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি।

২৭এ বৈশাখ, ১৩৪৪
ভাগলপুর

"বনফুল"

১

কাছারি-বাড়ির সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান। আজ সেখানে বহু লোকের জনতা। 'তৌজি'র দিন। জমিদারের কাছারিতে সকলে খাজনা জমা দিতে আসিয়াছে।

প্রবীণ গোমস্তা হরিহর দাস খাতা খুলিয়া কাছারি-বাড়ির বারান্দার এক কোণে বসিয়া এ অঞ্চলের ধনী মহাজন গোলোকচন্দ্র সাহার সহিত চুপিচুপি কি কথাবার্তা কহিতেছেন।

সম্মুখস্থ নিমগাছটার নীচে বসিয়া কয়েকজন প্রজা একটু উত্তেজিতভাবেই কি যেন আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে রুক্ষপ্রকৃতির একটি যুবক বলিতেছিল, ন্যায্য খাজনা দিয়ে থাকব, তার আবার এত ভয়টা কিসের? ভারি তো আমার—! প্রবীণ-গোছের বিশাই মণ্ডল তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল, অত রক্ত গরম করলে জমিদার-বাড়িতে কাজ হাঁসিল হয় না। একটু ঠাণ্ডা মেজাজে কথাবার্তা কইতে হয়।

যুবকের মেজাজ ঠাণ্ডা নয়। ফলে কলরব বাড়িতেছিল।

আর একটু দূরে একটি যুবতীকে কেন্দ্র করিয়া আর কয়েকজন প্রজাও দাঁড়াইয়া নানারূপ পরামর্শ করিতেছিল। ব্যাপারটা গোপনীয়। তাহাদের মুখে চোখে সে ভাবটা পরিস্ফুট।

নিকটেই একটা আটচালায় কতকগুলি লোক আহারে

ব্যস্ত। দধি, চিঁড়া এবং গুড়ের ফলার চলিতেছে। যে আসিবে, সেই খাইতে পাইবে।

মুন্‌শীজী খাওয়া-দাওয়ার তদারক করিতেছেন।

আটচালার দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলি প্রজাকে লইয়া রমজান তহশীলদার বেশ জমাইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। বক্তৃতার বিষয়টা এই যে, জমিদার তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে। তাঁহার নির্দেশমতই তিনি উত্থান ও উপবেশন করেন, অর্থাৎ ওঠেন বসেন। সুতরাং তাঁহাকে হাতে রাখিতে পারিলে প্রজাদের সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই নাই। প্রজারা হাঁ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছিল।

মাঠের মধ্যে দু-একটি গরুর গাড়িও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে নানা জাতীয় উৎসুক ও চিন্তাগ্রস্ত লোক মুখ বাহির করিয়া আছে।

এক জায়গায় সারি সারি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া নগ্নগাত্র কতকগুলি লোক বসিয়া ছিল। তাহারা নিতান্তই গরিব প্রজা। তাহাদের আশ্বাস দিবার কিংবা তাহাদের হইয়া কিছু বলিবার কেহ নাই। ইহাদের সংখ্যাই বেশি। তাহারা নিজেদের মধ্যেই চুপিচুপি কথাবার্তা বলিতেছে। চতুর্দিকে একটা মৃদু গুঞ্জন।

সহসা চতুর্দিক সচকিত করিয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং নিমেষের মধ্যেই বিশাল অশ্বপৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠকায় দীর্ঘদেহ ব্যক্তি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

সমবেত জনমণ্ডলী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া আভূমি প্রণত

হইয়া সেলাম করিল। আগন্তুক গম্ভীরভাবে শির ঈষৎ আনত করিয়া অভিবাদন গ্রহণ করিলেন এবং সহিসের হাতে লাগাম ও চাবুক দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত উগ্রমোহন সিংহের অভ্যাগমে সমস্ত কাছারি-বাড়িটা গমগম করিতে লাগিল।

দেওয়ানজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রভুর অনুগমন করিলেন।

২

জমিদার উগ্রমোহন সিংহ একটা উঁচু মসনদের মত আসনে বসিয়া ছিলেন। রাখালবাবু—অর্থাৎ দেওয়ানজী, নিকটেই তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রভুর কর্ণগোচরযোগ্য বিষয়গুলি একে একে বলিয়া যাইতেছিলেন। নিবিষ্টচিত্তে সিংহ মহাশয় সব শুনিতেছিলেন। আদ্যোপান্ত সব শুনিয়া তিনি আদেশ দিলেন, ডাক তাকে।

সেই রুক্ষপ্রকৃতির যুবকটি আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া উগ্রমোহনবাবু পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলবার আছে তোর? বিধবার গায়ে হাত দিয়েছিস কেন?

ছোকরা আমতা-আমতা করিয়া কি খানিকটা বকিয়া গেল।

উগ্রমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন, জুতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেব, জানিস? এই মহাব্বত খাঁ!

সঙ্গে সঙ্গে সেলাম করিয়া লম্বা-চওড়া চেহারা চাপদাড়ি-সমন্বিত মহাব্বত খাঁ হাজির হইল।

উগ্রমোহন হুকুম দিলেন, পঁচিশ জুতি লাগাও।

কম্পিত-কলেবর যুবককে লইয়া মহাব্বৎ খাঁ চলিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন আবার আদেশ করিলেন, ওর বাপকে ডাক।

বৃদ্ধ বিশাই মণ্ডল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

তোমরা আমার জমিদারি ছেড়ে এক মাসের মধ্যে উঠে চ'লে যাও। আমার জমিদারিতে তোমাদের স্থান নেই।

হুজুর—

কিছু শুনতে চাই না আমি। এক মাসের মধ্যে যদি তোমরা উঠে না যাও, ঘরে তোমাদের আগুন লাগিয়ে দেব। যাও।

বিশাই চলিয়া গেল।

উগ্রমোহন বলিলেন, ডাক সেই বিধবাকে।

বিধবা আসিল ও তাহার সহিত তাহার দূরসম্পর্কের এক খুল্লতাতও আসিলেন। খুল্লতাত যেমনই শুরু করিলেন, দোহাই হুজুর, আপনি হলেন আমাদের—, অমনই উগ্রমোহন সপদদাপে বলিয়া উঠিলেন, চোপরাও! কে তোমাকে আসতে বলেছে? এই, কোন্ হ্যায়?

খুল্লতাত ত্বরিতগতিতে বহির্গমন করিলেন।

উগ্রমোহন তখন বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রামে এত মেয়ে থাকতে তোমার গায়েই বা লোকে হাত দেয় কেন? জবাব দাও।

বিধবা মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিধবা মানুষ, তোমার মাথায় অত খোঁপা কেন? দেওয়ানজী!

হুজুর!

এখনই নাপিত ডেকে এর মাথার চুল কামিয়ে দাও। আর ওকে বুঝিয়ে দাও যে, আবার যদি ওর ওপর কেউ নজর দেয়, ওকেই আমি গ্রামছাড়া করব। সব প্রজাদের তো আমি দূর ক'রে দিতে পারি না। যাও।

যে আজ্ঞা।

বিধবাকে লইয়া দেওয়ানজী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দেওয়ানজী ফিরিয়া আসিলে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আর কি কাজ আছে?

আজ্ঞে, কতকগুলি গরিব সাঁওতাল প্রজা এসেছে, তারা নিবেদন করছে যে—

রূঢ়কণ্ঠে উগ্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তাদের নিবেদন, তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না। বুড়ো বয়সে ঘুষ খাচ্ছ নাকি? ডাক তাদের।

সেই নগ্নকায় প্রজার দল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের বক্তব্যটা উগ্রমোহন আগেই কি করিয়া যেন টের পাইয়াছিলেন। তাহাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, খাজনাপত্তর কিছু আনিস নি তো?

তাহারা কহিল যে, অগ্ঘানি ফসলটা ভাল না হওয়ার দরুন তাহারা সম্পূর্ণ খাজনাটা আনিতে পারে নাই, হুজুর যদি

অনুগ্রহ করেন এবং ভগবানের যদি কৃপা থাকে, আগামী বৈশাখীতে তাহারা বাকিটা শোধ করিয়া দিবে।

আচ্ছা। এবার কিন্তু যদি শোধ দিতে না পার, তখন আর কিছু শোনা হবে না।

ইহা শুনিয়া একজন বৃদ্ধ-গোছের প্রজা প্রস্তাব করিল যে, যদি তাহারা শোধ না দেয়, তাহা হইলে হুজুর যেন তাহাদের নিকট হইতে সুদ আদায় করিয়া লয়।

উগ্রমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন, সুদ! বৈশাখীতে যদি না দাও, জুতো মেরে আদায় ক'রে নেব। সুদের হিসেব করবার আমার সময় নেই।

প্রজার দল চলিয়া গেল।

দেওয়ানজীকে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, আর বাকি কি আছে?

আজ্ঞে, গোলোক সাকে ডাকতে বলেছিলেন, সে এসেছে।

ডাক তাকে।

গোলোক সার নাম শুনিবামাত্র উগ্রমোহনের মুখখানা ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল।

গোলোক সাহা আসিল। গোলোক সাহা এই অঞ্চলে তেজারতী কারবার করিয়া থাকে। তাহার নামে লোকের ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়া যায়—এইরূপ জনশ্রুতি। তাহাকে দেখিয়া বোঝা দুঃসাধ্য যে, সে যে-কোন মুহূর্তে লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে। গোলোক সার মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মুখটি গোলোক সদৃশ। ঘরে প্রবেশ করিয়া গোলোক সাহা অত্যন্ত

ভক্তিভরে ভূমিতে ললাটদেশ স্পর্শ করাইয়া উগ্রমোহনকে প্রণাম করিল। কিন্তু প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই উগ্রমোহন আসিয়া গোলোক সাহার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, খুব বেশি টাকা হয়েছে, না?

গোলোক সা টালটা সামলাইয়া গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

তর্জনী আস্ফালন করিয়া উগ্রমোহন বলিতে লাগিলেন, আজ এই দ্বিতীয়বার তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, চন্দ্রকান্ত রায়কে তুমি টাকা ধার দিতে পারবে না। যদি দাও, মুশকিলে প'ড়ে যাবে।

গোলোক সা নয়নে অশ্রু আনিয়া বলিল, চন্দ্রকান্তবাবু তো আপনারই সম্বন্ধী হুজুর। কি ক'রে তাঁর আদেশই বা অমান্য করি?

উগ্রমোহন বলিলেন, তুমি আমার জমিদারিতে বাস ক'রে আমার বিপক্ষ জমিদারকে টাকা দিতে পারবে না। তা সে আমার সম্বন্ধীই হোক, আর যেই হোক। বুঝলে? যাও। আবার যদি খবর পাই যে, তুমি চন্দ্রকান্তকে টাকা দিয়েছ—

আর কি দিতে পারি হুজুর?

যাও।

গোলোক সাহা চলিয়া গেল।

তাহার পর উগ্রমোহন দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রকান্তের নামে সেই ফৌজদারিটা দায়ের ক'রে দিয়েছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আসামী কাকে কাকে করা হয়েছে ?

চন্দ্রকান্তবাবু, রামপিরীত, অহঙ্কার পাঁড়ে।

আচ্ছা। আর কিছু কাজ বাকি রইল নাকি ?

আজ্ঞে না। গোপাল পাস ক'রে এসেছে। আপনাকে প্রণাম করবে ব'লে বাইরে অপেক্ষা করছে।

ডাক।

রাখালবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র গোপাল আসিয়া প্রণাম করিল।

উগ্রমোহনবাবু বলিলেন, বাঃ, বেশ। দেওয়ানজী, গোপালকে আমাদের হাবেলির চিকিৎসক ক'রে বাহাল ক'রে নাও।

গোপাল ডাক্তারি পাস করিয়া আসিয়াছে।

কাজকর্ম শেষ করিয়া জমিদার উগ্রমোহন সিংহ অশ্বারোহণে কাছারি ত্যাগ করিলেন। ধাবমান অশ্বটার দিকে সকলে সভয়ে চাহিয়া রহিল।

প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীযুক্ত উগ্রমোহন সিংহের দুর্জয় প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত না। তাহার কারণ এই যে, যদিও তাঁহার জমিদারিতে গরু যথেষ্ট ছিল, কিন্তু একটিও বাঘ ছিল না।

৩

সন্ধ্যা আসন্ন।

পশ্চিম দিগন্তে মহাসমারোহে সূর্য অস্ত যাইতেছে। ছোট, বড়, কালো, সাদা, স্তর, স্তূপ—সকল প্রকার মেঘেই অস্তগামী

সূর্যের দীপ্ত প্রভাব। কেহই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। অস্তগামী রবির আলোক-সমুদ্রে যেন তাহারা ছোট ছোট দ্বীপ। বিভিন্ন ভঙ্গীতে সকলেই যেন এই বিরাট দৃশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। অস্তালোকচ্ছটার বিচিত্র অভিব্যক্তির ঐকতানে চরাচর সম্মোহিত। প্রান্তর-লক্ষ্মী ক্ষুদ্র নদীটিও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে। তাহার ঊর্মিশিহরিত বক্ষেও এই শাশ্বত স্বপ্নের ক্ষণিক উৎসব। তরঙ্গে তরঙ্গে অবর্ণনীয় বর্ণ-বিন্যাস। সে যেন চঞ্চল গতিবেগকে ক্ষণিকের জন্য সংহত করিয়া অস্তগামী সূর্যকে বর্ণ-অভিনন্দন জানাইতে ব্যগ্র।

দিগন্ত-প্রসারী সরিষার ক্ষেত্র, যেন দিগন্ত-প্রসারী একখানি সোনার স্বপ্ন, লক্ষ কোটি ফুলে আত্মহারা।

মাঠের আলের উপর দিয়া অশ্বারোহণে মন্থরগতিতে উগ্রমোহন এই দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছেন। সহসা তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, ধীরে ধীরে নদীতীরে গিয়া পরিচ্ছদাদি খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সুগৌর নগ্ন গাত্রে শুভ্র উপবীত মাত্র শোভা পাইতে লাগিল। চক্রবাল-রেখা-লীন সূর্যকে উদ্দেশ করিয়া সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে উগ্রমোহন উদাত্ত কণ্ঠে সূর্য-বন্দনা করিলেন। হস্তে জলের অর্ঘ্য।—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

উগ্রমোহনের উদ্ধত শির সূর্যপ্রণামে অবনমিত হইল। সূর্য-

প্রণাম শেষ করিয়া উগ্রমোহন মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে পশ্চিম-আকাশের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সূর্য অস্ত গেল।

* * * *

উগ্রমোহন যখন বাড়ি ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। শিবমন্দিরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি তখনও থামিয়া যায় নাই। তিনি অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন। শয়ন-কক্ষে গিয়া দেখিলেন, পত্নী রাণী বহ্নিকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেছেন।

মৃদুহাস্যসহকারে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, উপস্থিত কার প্রেমে পড়েছ? জগৎসিংহ, না, গোবিন্দলাল?

বহ্নিকুমারী পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের।

সে আবার কে?

জগৎসিংহকে চেন, অথচ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে চেন না?

কি ক'রে চিনব? কখনও পড়ি নি, ও নাম দুটো শোনা ছিল।

এইবার বহ্নিকুমারী পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া ছদ্মবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, এতকাল কি করেছ তা হ'লে? আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তো এই সেদিন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রও পড় নি?

তোমার দাদার মত উপন্যাস, কবিতা, গান, বাজনা নিয়ে থাকব—এত বড় দুর্মতি কোন কালে আমার যেন না হয়। আমার যৌবন কেটেছে কুস্তিগীরের সঙ্গে, ঘোড়ার পিঠে।

উপন্যাস হাতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে নয়। তোমাদের অবশ্য ওসব সাজে।

বহ্নিকুমারী কিছু না বলিয়া উগ্রমোহনের দিকে শুধু চাহিয়া রহিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত আয়ত চক্ষু দুইটিতে তীব্র ব্যঙ্গ যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। কানের হীরার দুল দুইটি যেন দুলিয়া দুলিয়া উগ্রমোহনের এই শোচনীয় মূর্খতাকে নীরবে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। উগ্রমোহন এই নীরব ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় অভিভূত হইয়া অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলিয়া ফেলিলেন, দু দিনেই বোঝা যাবে, কে বেশি বুদ্ধিমান—তোমার দাদা, না, আমি!

বলিয়া তিনি মাথার পাগড়িটা নামাইয়া, দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আলস্যভরে গা ভাঙিয়া, দুই হাত কোমরে দিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর বহ্নিকুমারী বলিলেন, তোমার বুদ্ধিও তো কম নয়। তা না হ'লে আমার দাদার দেওয়া 'বাণী' নামটাকে বদলে 'বহ্নি' ক'রে দিলে!

নামটা তোমার পছন্দ হয় নি?

বহ্নিকুমারী কোনও উত্তর দিলেন না। কেবল হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরব হাসিতে উগ্রমোহনকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিলেন। উগ্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তুমি তো আগুন। তোমার নাম কি বাণী মানায়? বহ্নিকুমারীই তোমার উপযুক্ত নাম। পছন্দ হয় নি তোমার? আশ্চর্য!

বলিয়া উগ্রমোহন নিকটস্থ একটি সোফায় উপবেশন

করিলেন। বহ্নিকুমারী নির্নিমেষ নেত্রে এতক্ষণ স্বামীর বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। স্বামী উপবেশন করিতেই বিনা ভূমিকায় স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া বাহু দিয়া তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিলেন, তর্ক থাক, ছাদে চল। কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না আজ!

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, ঠিক ক'রে বল তো তোমার কাকে বেশি ভাল লাগে? আমাকে, না, তোমার দাদাকে? কে ভাল? আমি, না, চন্দ্রকান্ত?

বহ্নিকুমারী হাসিয়া উত্তর দিলেন, সিংহে আর ময়ূরে তুলনা হয় কি? চল, ছাদে যাই।

উভয়ে ছাদে গেলেন।

এই উপমাটায় উগ্রমোহন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

সুপুষ্ট গুম্ফে চাড়া দিতে দিতে তাই তিনি বলিয়া ফেলিলেন, বাঃ, সুন্দর শানাইটা বাজছে তো! চমৎকার পূরবী ধরেছে।

বহ্নি দেবীর চক্ষু দুইটি নীরব হাস্যে আবার প্রখর হইয়া উঠিল।

উগ্রমোহন পত্নীর চক্ষুর এই ভাষাময় বিদ্রূপ বুঝিতেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, পূরবী নয়?

না, ইমন-কল্যাণ।

শুনিয়া উগ্রমোহন মনে মনে আবার দমিয়া গেলেন। এ বিষয়ে বহ্নি যে সত্যই বেশি সমঝদার এবং বহ্নির মানসিক এই

উৎকর্ষের মূলে যে চন্দ্রকান্তের প্রভাব বিদ্যমান, তাহা অনুভব করিয়া উগ্রমোহন মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। দূরে নহবৎখানায় ইমন-কল্যাণে শানাই বাজিতেছে। জ্যোৎস্না আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা বহ্নি দেবী বলিয়া উঠিলেন, আমারই ভুল হয়েছিল। এ ইমন-কল্যাণ নয়, পূরবীই।

উগ্রমোহন বলিলেন, তাই নাকি?

এমন সময় নীচে শব্দ শোনা গেল, হুম্ ব্রো, হুম্ ব্রো, হুম্ ব্রো।

উগ্রমোহন উঠিলেন। বলিলেন, চন্দ্রকান্তের পালকি এল। যাই, একটু দাবায় বসি।

উভয়ে নীচে নামিয়া গেলেন।

নীচে বৈঠকখানায় একটি গালিচার উপর দাবার ছকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহন বসিয়া আছেন, কে বলিবে এই চন্দ্রকান্তকে ফৌজদারী মকদ্দমায় আসামী করিয়া উগ্রমোহন দেওয়ানজীকে মকদ্দমা দায়ের করিতে হুকুম দিয়া আসিয়াছেন! চন্দ্রকান্তও যে আসিবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে উগ্রমোহনের একটা জলকর লুঠ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও তাঁহার মুখ দেখিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব।

বহুকালাবধি এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। বৈষয়িক ব্যাপারে একজন আর-একজনকে জব্দ করিবার জন্য অহরহ

সচেষ্ট। অথচ প্রত্যহ সন্ধ্যায় দুই শালা-ভগ্নীপতির একত্র বসিয়া দাবা খেলা চাইই।

সন্ধ্যায় দাবার ছক লইয়া দুইজনে যখন বসেন, তখন তাঁহারা যেন পরম মিত্র। আজ পর্যন্ত কেহ কখনও সামনা-সামনি বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করেন নাই। বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনা আদালতে হওয়াই সঙ্গত, বৈঠকখানায় নহে,—যেমন দাবা খেলার আলোচনা বৈঠকখানাতেই শোভন, আদালতে নহে। ইহাই যেন উভয়ের মনোভাব।

চন্দ্রকান্তের ছিপছিপে শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা। গোলাকার মুখে শুকচঞ্চুর মত নাসা। গোঁফ-দাড়ি কামানো। চোখে মুখে বুদ্ধির জ্যোর্তি ঝলমল করিতেছে।

একজন চাকর দুইটি রূপার গেলাসে করিয়া সিদ্ধি লইয়া আসিল।

উভয়ে নীরবে তাহা নিঃশেষ করিয়া আবার দাবার ছকে মন দিলেন।

ভৃত্য গেলাস লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল

৪

সেদিন সকাল হইতে বাদল নামিয়াছে। সূর্যের দেখা নাই। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। পথে লোকজন নাই বলিলেই হয়। চন্দ্রকান্ত রায় নিজের খাস-কামরায় বসিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত রায় শৌখিন লোক।

তাঁহার বসিবার ঘরটি তাঁহার নিজের রুচি অনুযায়ী সাজানো। টেবিল চেয়ার নাই। প্রকাণ্ড ঘরখানা জুড়িয়া একখানি দূর্বাদলশ্যাম মখমলের গালিচা পাতা। তাহার উপর কয়েকটি শুভ্র ওয়াড় পরানো তাকিয়া। গালিচার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একখানি রূপার পরাত। পরাতের উপর সুদৃশ্য একটি গড়গড়া মীনার কাজ করা। ঘরের কোণে একটি মেহগনি কাষ্ঠের তেপায়া এবং তেপায়ার উপর সোনা-রূপার কাজ করা একটি বড় ফুলদানি। ফুলদানিতে তিন-চারিটি কেয়াফুল দাঁড় করানো রহিয়াছে। ঘরের দেওয়াল পরিষ্কার চুনকাম করা। একখানিও ছবি নাই। সেতার এস্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র একটি কোণে ঠেসানো রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত তন্ময় হইয়া বসিয়া গান শুনিতেছিলেন। প্রিয় ওস্তাদ মিশিরজী তানপুরা হস্তে মিয়ামল্লার গান ধরিয়াছেন—

বূঁদন ভিজে মোরি শারী,
অব ঘর জানে দে বনবারি।
এক ঘন গরজে, দুজে পবন বহত,
তিজে ননদী মোসে দেত গারী॥

—কৃষ্ণের কাছে রাধিকার এই মিনতি গানের সুরে সুরে যেন কাঁদিয়া ফিরিতেছে। চন্দ্রকান্ত রায় মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। গড়গড়ার নল হাতে ধরাই আছে, তাহাতে টান দেওয়া আর হইতেছে না। এই প্রায়ান্ধকার নিবিড় বর্ষা-প্রভাতে তাঁহার সমস্ত অন্তর গানের তানে ভর করিয়া যমুনার কূলে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে তিনি যেন দেখিতেছেন, একটি গৌরী

কিশোরী এক শ্যামকান্তি কিশোরের দুইটি হাত ধরিয়া মিনতি করিতেছে, ওগো, আমাকে ছাড়িয়া দাও। এই বর্ষায় আমার শাড়ি ভিজিয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, জোরে বাতাস বহিতেছে। ননদী আমাকে গালি দিবে। এবার আমাকে ছাড়িয়া দাও।

গান বন্ধ হইল। কিছুক্ষণ উভয়েই নির্বাক। সুরের রেশ তখনও ঘরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চন্দ্রকান্ত রায় প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন, চমৎকার!

মিশিরজী দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন, হুজুরের মেহেরবানি।

দ্বারপ্রান্তে একজন বলিষ্ঠকায় জমাদার আসিয়া সেলাম করিল। চন্দ্রকান্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর ছোটন সিং?

ছোটন সিং বলিল, গতকল্য তাহারা হুজুরের হুকুম অনুযায়ী যে জলকরটি লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুই মণ মৎস্য তাহারা লইয়া আসিয়াছে। এখন কি করিতে হইবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত দেওয়ানজী তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত রায় বলিলেন, দেওয়ানজী যেন সমস্ত মৎস্যই উগ্রমোহনবাবুর নিকট উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়া দেন।

কোনও খুন-জখম হয়েছে?

তেমন বিশেষ কিছু নয়। রামঅওতার সিপাহীর মাথায় একটু চোট লাগিয়াছে, তবে তাহা সাংঘাতিক কিছু নয়।

আচ্ছা, যাও।

ছোটন সিং সেলাম করিয়া যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, গোলোক সাহা আসিয়া কাছারি-বাড়িতে বসিয়া আছে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এইখানে পাঠিয়ে দাও।

মিশিরজী বলিলেন, হুজুর যদি হুকুম দেন, তা হ'লে এবার উঠি। আমার স্নানাদি কিছুই এখনও সারা হয় নি। বলিলেন অবশ্য হিন্দীতে।

আচ্ছা।

মিশিরজী উঠিয়া গেলেন। গোলোক সা প্রবেশ করিল এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

সা-জী, ব'স। তারপর খবর কি ?

গোলোক সা সসঙ্কোচে উপবেশন করিয়া বলিল, খবর ভাল নয়।

ওরে ভজনা, তামাক দিয়ে যা।

ভজনা খানসামা আসিয়া কলিকা লইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত গোলোক সার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, খবর ভাল নয় মানে ?

গোলোক সা নিম্নস্বরে উত্তর দিল, ও-তরফে আমার ডাক পড়েছিল। উগ্রমোহনবাবু আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন কিছুতেই আপনাকে টাকা ধার না দিই।

চন্দ্রকান্তের চক্ষু দুইটি ক্ষণিকের জন্য দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার শান্তভাব ধারণ করিল। তাঁহার টাকার আর দরকার ছিল না। তথাপি তিনি বলিলেন, টাকা যখন চেয়েছি, তখন দিতে হবে বইকি।

ভজনা খানসামা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে দ্বারদেশে দেখা দিল।

চন্দ্রকান্ত অতি ধীরভাবে বলিলেন, আগামী বুধবার, অর্থাৎ পরশুদিন আমার গোমস্তা রাধিকামোহন তোমার কাছে যাবে।

ভজনা কলিকাটা বেশ করিয়া ধরাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

গোলোক সা কাতরকণ্ঠে বলিল, আমার অবস্থাটা হুজুর, একবার ভেবে দেখুন। আমার যে ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর গোছ অবস্থা হ'ল।

বেশ, তুমি আমার জমিদারিতে এসে বাস কর। কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। পীরপুর বাজারে আমার নিজের একখানা খাস বাড়ি আছে। ইচ্ছে করলে কালই তুমি তাতে উঠে আসতে পার।

ভজনা খানসামা কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া নলটি প্রভুর হাতে দিয়া পিছু হাঁটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গড়গড়ায় একটা মৃদু-গোছের টান দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তা হ'লে সব ঠিক রইল। পরশুদিন রাধিকামোহন যাবে।

গোলোক সা খানিকক্ষণ বসিয়া মাথা চুলকাইল। পীরপুরের বাসায় আসিবে কি না, তাহাই ভাবিতেছিল বোধ হয়। কিন্তু সে যখন কথা কহিল, তখন বোঝা গেল, তাহার চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে কহিল, লেখাপড়াটা তা হ'লে—

রাধিকামোহনকে আমার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দেওয়া আছে। তার জন্যে ভাবনা নেই। টাকাটা তুমি মজুত রেখো। —নির্বিকারচিত্তে তিনি তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন।

গোলোক সা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে খানিকক্ষণ হাত বুলাইয়া অবশেষে বলিল, পীরপুরের বাসাটা—

হ্যাঁ, কালই আসতে পার।

গোলোক সা বিদায় লইল।

চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। অম্বুরি-তামাকের সুগন্ধে ঘর ভরিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই চন্দ্রকান্ত জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন যে, কলিকাতা হইতে আগত তাঁহার বন্ধুগণ শিকার করিয়া ফিরিতেছেন। হাতী গেটে ঢুকিল দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বালাপোশ-খানা গায়ে দিয়া বারান্দায় আসিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইলেন।

হস্তীপৃষ্ঠ হইতেই একজন শিকারী চিৎকার করিয়া বলিলেন, ওহে, ভারি গুড লাক। একটা ফ্লরিকান পেয়েছি।

হস্তী উপবেশন করিতেই তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, কায়েমও অনেকগুলো পেয়েছ দেখছি।

শিকারীদের মধ্যে আর একজন বলিলেন, চখাও পেয়েছি গোটা তিনেক।

কলরব করিতে করিতে সকলে অতিথি-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। শিকারীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিলেন। তখনও টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সে বৃষ্টিকে গ্রাহ্য

না করিয়া চন্দ্রকান্ত বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভজনা খানসামা উর্ধ্বশ্বাসে একটা ছাতা আনিয়া প্রভুর মাথায় ধরিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, থাক্, দরকার নেই।

অতিথি-ভবনে উপস্থিত হইবামাত্র দেখা গেল, সেখানে অতিথিদের জন্য ধূমায়িত গরম চা প্রস্তুত। তাহার সঙ্গে গরম ফুলকো লুচি এবং গরম গরম মাছ-ভাজা।

তাড়াতাড়ি বেশ-পরিবর্তন করিয়া সকলে প্রাতরাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন শিকারের গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন একজন সিপাহী আসিয়া খবর দিল যে, ম্যানেজারবাবু কোন জরুরি দরকারে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।

* * *

বাহিরে যাইতেই ম্যানেজারবাবু বলিলেন, রমেশবাবু বেলা তিনটে নাগাদ এন্‌কোয়ারি করতে আসবেন।

আচ্ছা।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রমেশবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উগ্রমোহন সিংহ চন্দ্রকান্ত-বাবুকে আসামী করিয়া যে মকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, তাহারই সম্বন্ধে তদন্ত করিতে আসিতেছেন। পূর্বেই এ খবর চন্দ্রকান্ত রায় জানিতেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কেহই বলিতে পারিবে না যে, তিনি আত্মরক্ষার বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন। উপরন্তু তিনি কলিকাতায় নিমাইবাবুকে তার করিয়াছেন, যেন তিনি অবিলম্বে সবান্ধবে আসিয়া উপস্থিত হন, এই সময়টা শিকার ভাল জুটিবে। নিমাইবাবু দুইজন

বন্ধু লইয়া গতকল্য আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নিমাইবাবু চন্দ্রকান্তের সহপাঠী। দুইজনে কলিকাতায় এম. এ. পড়িতেন।

আচ্ছা।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত তো ভিতরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু বিমূঢ় ম্যানেজার কমলাক্ষবাবু প্রভুর এতাদৃশ ঔদাসীন্যের কারণ কিছুই অনুমান করিতে না পারিয়া করতল দুইটি উল্টাইয়া চোখ-মুখের ভঙ্গীতে নৈরাশ্য-মিশ্রিত বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন এবং খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া কাছারি-বাড়িতে চলিয়া গেলেন।

* * *

বেলা তিনটার সময় রমেশবাবু ডেপুটি আসিলেন।

আসিয়াই তাঁহার নিমাইবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। নিমাইবাবু রমেশের ভগ্নীপতি।

আরে নিমাই যে, তুমি কোথা থেকে ?

গল্প জমিয়া উঠিল। চা খাবার গান বাজনা সহযোগে জিনিসটা আরও উপভোগ্য হইল। চন্দ্রকান্তবাবু হাস্যমুখে অতিথি-সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, রমেশবাবু রিপোর্ট দিলেন, চন্দ্রকান্ত রায় সম্পূর্ণ নির্দোষ। উগ্রমোহনের মামলা ফাঁসিয়া গেল।

৫

জমিদার উগ্রমোহন সিংহের বজরা বাহিনী-নদীর ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। বাহিনী একটি অখ্যাতনাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী।

গঙ্গার সহিত ইহার যোগ থাকাতে বর্ষার গঙ্গাজলে ইহা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই সময় নদীটি যে জলসঞ্চয় করিয়া লয়, তাহাতেই তাহার সারা বৎসর চলিয়া যায়। নদীটির বিশেষত্ব এই যে, নদীটি একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিরাট জঙ্গল, নাম যম-জঙ্গল। সত্যই জঙ্গলে প্রবেশ করিলে মনে হয়, যমালয় বোধ হয় নিকটেই কোথাও আছে। দিনের বেলায় রৌদ্র প্রবেশ করে না, চতুর্দিকে এমন নিবিড় ঘন অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে অবশ্য ফাঁকা জায়গাও আছে। এরূপ একটি ফাঁকা জায়গায় ঘাট। বজরা ঘাটে ভিড়িতেই চারিজন বরকন্দাজ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; বজরা হইতে নামিলেন উগ্রমোহন সিংহ, তাঁহার ম্যানেজার অঘোরবাবু এবং দুইটি সুন্দরী বালিকা। বালিকা দুইটির বয়ঃক্রম আট-নয় বৎসর এবং তাহারা দেখিতে প্রায় একই প্রকার। নাম রুম্‌নি ও ঝুম্‌নি। ইহাদের সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে। উগ্রমোহন-বাবুর মৃতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর একমাত্র কন্যা কমলার বিবাহ হইয়াছিল গরিবের গৃহে। কমলা উগ্রমোহনবাবুর খুব প্রিয় ছিল। সুতরাং কমলার বিবাহের পর উগ্রমোহন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, কমলাকে লইয়া গঙ্গাগোবিন্দ গৃহ-জামাতারূপে থাকুন, উগ্রমোহন তাঁহাকে সমাদরে রাখিবেন। কমলার স্বামী গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্র সাধারণ গরিব গৃহস্থ হইলেও এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। আত্মসম্মানজ্ঞান তাঁহার প্রবল ছিল। উগ্রমোহন সিংহও প্রবল প্রকৃতির লোক। সুতরাং খিটিমিটি চলিতেছিল। কমলার মুখ চাহিয়া উগ্রমোহন

গঙ্গাগোবিন্দের বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ঝুম্‌নিকে প্রসব করিয়া কমলা ইহলোক ত্যাগ করিল। কমলার মৃত্যুকালে উগ্রমোহন উপস্থিত ছিলেন। কমলা তাঁহাকে যাইবার সময় বলিয়া গেল, মামা, আমার মেয়ে দুটি তোমায় দিয়ে গেলাম। তাদের দেখো।

ইহা প্রায় নয় বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। এই নয় বৎসর ধরিয়া উগ্রমোহন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে গঙ্গাগোবিন্দের নিকট হইতে লইতে পারেন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ আর বিবাহ করেন নাই, কন্যা দুইটিকে লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহার দিন কাটিতেছিল। উগ্রমোহন বহুবার তাহাদের লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি কিন্তু দেন নাই। বিনীতভাবে তিনি একই উত্তর চিরকাল দিয়া আসিয়াছেন, আপনার অনুগ্রহ-দৃষ্টি থাকিলেই যথেষ্ট। রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে আমি দিতে পারিব না।

গতকল্য কিন্তু উগ্রমোহনের ধৈর্য ভাঙিয়াছে। এতদিন তিনি গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে শ্বশুরোচিত ভদ্রতা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর নয়। কাল তিনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পালকি পাঠাইয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের এত বড় স্পর্ধা, পালকি ফেরত পাঠাইয়া বিনীতভাবে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে কাল সকালে পাঠাইয়া দিব। রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে তাহাদিগকে আর পাঠাইলাম না। আশা করি, আপনি দুঃখিত হইবেন না।

উগ্রমোহনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সকালে

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আসিতেই তাহাদের লইয়া বজরাতে তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, সঙ্গে ম্যানেজারবাবুকে লইয়াছেন। কেন, কেহ জানে না। আসিবার সময় বাজারের যত মিষ্টান্ন ছিল সমস্ত কিনিয়া আনিয়াছেন। বাড়িতে বলিয়া আসিয়াছেন, বাগান দেখিতে যাইতেছি। যম-জঙ্গলে উগ্রমোহন সিংহের বাগান আছে। প্রায় পাঁচ শত মহিষ তাঁহার এই জঙ্গলে থাকে।

উগ্রমোহন সিংহ নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, পালকি ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ হুজুর।

সঙ্গে সঙ্গে তিনটি পালকি আসিয়া হাজির হইল। একটিতে উগ্রমোহন, একটিতে অঘোরবাবু এবং আর একটিতে রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আরোহণ করিলেন এবং ত্বরিতগতিতে পালকি তিনখানি নিঃশব্দে বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নধরকায় কৃষ্ণকান্তি মহিষগুলিকে উগ্রমোহন সিংহ মিষ্টান্ন খাওয়াইতেছিলেন—সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলাপি, যে যত খাইতে পারে। মহিষগুলির চিক্কণ মসৃণ গাত্র হইতে সূর্যকিরণ যেন পিছলাইয়া পড়িতেছিল।

অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে তাহারা মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া চলিয়াছে। উগ্রমোহন স্বয়ং দাঁড়াইয়া তদারক করিতেছেন। হঠাৎ তিনি পরিচারক গোয়ালাটিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, হ্যাঁ রে, মহিষদের গায়ে শিঙে আজ ঘি মাখিয়েছিস তো?

একটু পরে মাখানো হবে হুজুর।

একটু পরে কেন? সকালে মাখাবার কথা!

বড় বাথান থেকে আজ ঘি এসে পৌঁছয়নি এখনও।

উগ্রমোহন সিংহ হাঁকিলেন, মনক্কা পাঁড়ে!

মনক্কা পাঁড়ে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তুম্ আভি যা কর্ বড়া বাথানমে খবর লেও, ঘিউ কাহে নৈ য়হা পৌঁছা!

মনক্কা পাঁড়ে চলিয়া গেল।

তাহার পর উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে এখন কটা মোষ আছে?

পঞ্চাশটা। বাকি সব বড় বাথানে আছে।

উগ্রমোহন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। এই বাথানে আসন্নপ্রসবা মহিষীগুলি এবং যে সব মহিষীর বাছুর বড় হইয়া দুধ বন্ধ হইয়াছে, তাহারাই থাকে।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, দুশমন কোথা?

নদীতে আছে।—বলিয়া গোয়ালাটি কণ্ঠ হইতে এক বিচিত্র শব্দ করিতে লাগিল, আঁঃ-হা-হা-হা-হা-হা—আঁঃ-হা-হা-হা। একটু পরে দেখা গেল, মৃদু শব্দ করিতে করিতে কর্দমাক্তদেহ এক বিরাট মহিষ বনজঙ্গল ভেদ করিয়া আসিতেছে।

দুশমন বিরাটকায় পুরুষ মহিষ। উগ্রমোহনের বড় প্রিয়। উগ্রমোহন স্বহস্তে তাহাকে খাবার খাওয়াইতে লাগিলেন।

খাওয়ানো শেষ হইলে তিনি তাহার গলদেশে আদর করিয়া একটু হাত বুলাইয়া দিতে দুশমন গলিয়া গিয়া আনন্দে গলা বাড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই উগ্রমোহনের সুসজ্জিত অশ্ব আসিল। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি গভীরতর জঙ্গলে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। মুখে গভীর চিন্তার রেখা। এই পথেই কিছুক্ষণ পূর্বে ম্যানেজারবাবু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লইয়া গিয়াছেন।

*　　　*　　　*

জঙ্গলের ভিতর দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে মন্থরগতিতে আসিতে আসিতে উগ্রমোহন সিংহ রুম্‌নি-ঝুম্‌নি সম্বন্ধে যাহা করিবেন, ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্রের নিকট আর ফিরিয়া যাইবে না।

উগ্রমোহনের অশ্ব বনজঙ্গল ছাড়াইয়া একটি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইতেই একজন সহিস ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। উগ্রমোহন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সহিসের হস্তে বল্গা চাবুক প্রভৃতি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ম্যানেজারবাবু এসে পৌঁছেছেন?

সহিস উত্তর দিল, হাঁ হুজুর।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি?

হাঁ হুজুর।

কোথায় তারা?

কাছারি-বাড়িতে আছে।

অল্প দূরেই একটি আটচালা ছিল। মাটির ঘর। কিন্তু আয়তনে প্রকাণ্ড। চতুর্দিকে বারাণ্ডা। ইহা উগ্রমোহন সিংহের জংলি-কাছারি নামে পরিচিত। উগ্রমোহন সেই দিকেই পদচালনা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি, তাঁহার ম্যানেজার এবং প্রবীণ জমাদার ভিখন তেওয়ারি সকলেই একটি সদ্যোধৃত বন্য শশককে লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির আগ্রহ সীমা অতিক্রম করিয়াছে। উগ্রমোহন উপস্থিত হইতেই তাহারা উগ্রমোহনকে আসিয়া ধরিল, দাদু আমরা খরগোশ পুষব।

উগ্রমোহন বলিলেন, তোরা তো সিংহ পুষেছিস। খরগোশের শখ কেন? আমার গোঁফ জোড়া পছন্দ হয় না?—বলিয়া তিনি নিজের পুষ্ট গুম্ফে চাড়া দিলেন। ম্যানেজারবাবু ও ভিখন তেওয়ারি প্রভুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাঁহাকে রসিকতা-প্রবণ দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া আড়ালে গেল। আড়ালে যাওয়াই নিরাপদ। কারণ উগ্রমোহনের সম্মুখে হাসিয়া ফেলিলে আর রক্ষা নাই। 'একবার এক নায়েব হাসিয়া ফেলাতে উগ্রমোহন তাহার কর্ণ-মর্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূর করিয়া দেন। উগ্রমোহন রসিক লোক; তিনি তাঁহার নাতনী বা বয়স্য সকলের সঙ্গেই বেশ প্রাণখোলা রসিকতা করেন। কিন্তু ভৃত্য-স্থানীয় কেহ তাহাতে যোগ দিয়া হাসিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শিক্ষা দিয়া দেন।

রুম্‌নি কহিল, খরগোশের কান দুটি সুন্দর।

ঝুম্‌নি কহিল, চোখ দুটিও।

উগ্রমোহন নিকটস্থ একটি মোড়ায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, তোদের পছন্দ অতি বাজে দেখছি। গোঁফ কই?

ওই তো রয়েছে।

আরে, ওটা কি একটা গোঁফ! আমার দেখ, তো কেমন!

রুম্‌নি কহিল, আপনি যে এত পাখী পুষেছেন, গোঁফ আছে নাকি কারও? তবে পুষেছেন কেন?

পাখি কেমন গান গায়, কথা বলে! খরগোশ পারবে?

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি দেখিল, তর্ক দ্বারা দাতুকে পরাজিত করা তাহাদের সাধ্যাতীত। তাহারা উভয়ে তখন দাতুর কোলে চড়িয়া আবদারের সুর ধরিল, না দাতু, আমরা পুষব।

উগ্রমোহন বলিলেন, আচ্ছা, বেশ। আমারও কিন্তু একটা কথা রাখতে হবে। আমি এখন এইখানে একমাস থাকব। তোমাদেরও থাকতে হবে। থাকতে পারবে তো আমার কাছে? বাবার কাছে যেতে চাইবে না?

বাবা যদি বকেন?

আমার কাছে থাকলে বকবে কেন?

তুমি এখানে থাকবে এক মাস? দিদি কার কাছে থাকবে তা হ'লে?

আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দিদিকে দেখে আসব।

তখন আমরা কার কাছে থাকব?

হাসিয়া উগ্রমোহন বলিলেন, কেন খরগোশের কাছে। অঘোরবাবুও থাকবে।

তখন রুম্‌নি-ঝুম্‌নি সাগ্রহে বলিল, অঘোরবাবু বেশ লোক দাছু, এই দেখ, আমাদের হাতে কেমন মানুষ এঁকে দিয়েছে।

উভয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সত্যই দুইটি মনুষ্য-মুখ আঁকা আছে, উগ্রমোহন দেখিলেন।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আরও বলিল, কাপড় দিয়ে ঘোমটা ক'রে দিলে কেমন বউ হয়! বলিয়া তাহারা অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর অবগুণ্ঠন রচনা করিয়া মহা খুশী হইয়া উঠিল। উগ্রমোহন বুঝিলেন, চতুর ম্যানেজার বালিকা দুইটিকে বশ করিয়াছে। তিনি খুশী হইলেন।

* * *

এক ঘণ্টা পরে তিনি ম্যানেজারবাবুকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, নিমাইনগরের মৃন্ময় ঠাকুরের নিকট একটি পালকি এবং একজন সিপাহী পাঠাও। অবিলম্বে তাঁর আমি সাক্ষাৎ চাই।

* * *

সন্ধ্যার অনতিকালপূর্বে জংলি-কাছারির একটি কোণের ঘরে পঞ্জিকা-হস্তে উগ্রমোহন সিংহ বসিয়াছিলেন। সম্মুখে শতরঞ্জির উপর মৃন্ময় ঠাকুর। রোগা-গোছের লোকটি, বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হইবে। দক্ষিণ গণ্ডের খানিকটা পুড়িয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য মুখাবয়বের সেই অংশটি কুঞ্চিত এবং দক্ষিণ চক্ষুটি অস্বাভাবিক ভাবে বিস্ফারিত। এই খুঁতটুকু না থাকিলে মৃন্ময় ঠাকুরকে সুশ্রীই বলা চলিত। মৃন্ময় ঠাকুর নিমাইনগরের একজন বর্ধিষ্ণু প্রজা। সহসা উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে পালকি

পাঠাইয়া আহ্বান করিলেন কেন, তাহা মৃন্ময় ঠাকুর বুঝিতে পারেন নাই এবং বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিতেছিল। উগ্রমোহনকে তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন।

সহসা উগ্রমোহন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, দেখ মৃন্ময়, এক বিশেষ জরুরি ব্যাপারে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

অনুমতি করুন।

আগামী তেইশে মাঘ দেখছি বিবাহের ভাল দিন আছে। বলিয়া তিনি পঞ্জিকাটি খুলিয়া আর একবার দেখিলেন। হ্যাঁ, তেইশে মাঘ। আমি মনস্থ করেছি, আমার নাতনী তুটির সঙ্গে তোমার ছেলে তুটির উক্ত দিন বিবাহ দেব।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলে বোধ হয় মৃন্ময় ঠাকুর এতটা আশ্চর্য হইতেন না। উগ্রমোহনের কথা শুনিয়া মৃন্ময় ঠাকুর একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন। তাঁহার বিস্ফারিত দক্ষিণ চক্ষুটি আরও একটু বিস্ফারিত হইল মাত্র।

উগ্রমোহন মৃন্ময়ের এই ভাবান্তর গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া বলিয়া চলিলেন, কুলে শীলে তুমি গঙ্গাগোবিন্দের সমতুল্য ঘর। বরং তোমার অবস্থা ভাল। অবস্থার জন্য কিছু যায়-আসে না। আমি আমার নাতনীদের যথেষ্টই দেব। তবে একটা কথা আছে। আমার নাতনী কিংবা নাতজামাইদের আমি যখনই দেখতে চাইব, 'না' বলতে পাবে না। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, গঙ্গাগোবিন্দের অমতে আমি এ বিয়ে দেব। আমি নিজেই সম্প্রদান করব। এ নিয়ে যদি মামলা হয়, তার ভার আমার। বুঝলে? কথা বলছ না কেন?

মৃন্ময় ঠাকুর সব কথা ঠিকভাবে বুঝিয়াছিলেন কি না, তিনিই জানেন ; কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, হুজুর যখন ঠিক করেছেন, এতে আর আমার আপত্তি কি থাকতে পারে? এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে বাড়িতে একটু জিজ্ঞাসা করলে হ'ত না?

উগ্রমোহন বলিলেন, তাতে লাভ কি? ধর, যদি তোমার গিন্নী আপত্তি করেন, তা হ'লে তো সত্যি সত্যি তুমি আর বিয়ে উলটে দিতে পারবে না। তার চেয়ে বরং একেবারে খবর দাওগে যে, উগ্রমোহনবাবুর নাতনীদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা ক'রে এলাম। ধানদূর্বা সব এইখানেই আছে, আমার নাতনীদের আশীর্বাদ ক'রে একেবারে বাড়ি যাও।

একটু থামিয়া উগ্রমোহন আবার বলিলেন, আমিও আজই তোমার ছেলেদের আশীর্বাদ ক'রে তবে বাড়ি ফিরব।

নির্বাক মৃন্ময় ঠাকুরের আর দ্বিরুক্তি করিবার সামর্থ্য রহিল না।

* * *

সেই দিনই সন্ধ্যার পর রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ঘুমাইলে উগ্রমোহন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গেলেন এবং নিমাইনগরে পৌঁছিয়া মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদের আশীর্বাদ করিলেন।

মনে অসীম তৃপ্তি লইয়া যখন তিনি স্বগ্রামে ফিরিতেছিলেন, তখন এক প্রহর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আকাশে নক্ষত্রের দীপালী, চতুর্দিক অন্ধকার। সহসা পূর্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া কৃষ্ণা-চতুর্থীর চন্দ্রোদয় হইল। উগ্রমোহন দেখিলেন,

স্বাতীনক্ষত্র চাঁদের কাছেই রহিয়াছে। স্বাতী চন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী। সহসা উগ্রমোহন ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিলেন, অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। উগ্রমোহন ভাবিতে লাগিলেন, বহ্নি না জানি এতক্ষণ কি করিতেছে!

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেওয়ানজী কাতরমুখে বসিয়া আছেন। প্রভুকে দেখিয়া তিনি আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর, এখনও বাড়ি যাও নি?

রাখালবাবু ভীতমুখে অস্ফুটস্বরে কেবল বলিলেন, হুজুর—

তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না।

বিস্মিত উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি?

মরিয়া হইয়া রাখালবাবু বলিয়া ফেলিলেন, বাহারকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার মানে! চন্দনদাস কোথা?

তার সুদ্ধ খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

উগ্রমোহন ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রকান্ত আজ সন্ধ্যের সময় এসেছিল?

আপনি ফিরেছেন কি না খোঁজ নেবার জন্যে একজন সিপাহী এসেছিল।

তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন বলিলেন, পালকি তৈরি করতে বল। চন্দ্রকান্তের কাছে যাব।

রাখালবাবু পালকির হুকুম দিতে বাহিরে গেলেন।

উগ্রমোহনের পালকি আসিয়া চন্দ্রকান্তের খাস-কামরার বারান্দার নীচে থামিল। চন্দ্রকান্ত ভিতরে বসিয়া সঙ্গীতচর্চা করিতেছিলেন। উগ্রমোহন আসিতেই তিনি বলিলেন, আরে, এস এস। ভারি ভাল একটা গান শিখেছি আজ। শুনবে? ওরে ভজনা, তানপুরাটা আন্ তো রে!

উগ্রমোহন ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিছু বলিলেন না।

তানপুরা আনিলে সহাস্যমুখে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, শোন এবার। বাহার চৌতাল, সদারঙ্গের গান। বিনা সঙ্গতেই শোন।—

সব বনমে কৈসে শোহে ঋতুরাজ দিন আই—

গান শেষ হইলে উগ্রমোহন বলিলেন, আমার বাহারও চুরি গেছে আজ। চন্দনও সরেছে।

ছদ্মবিস্ময়ে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই নাকি?

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, যাক, গরুর শোকে অতটা উতলা হ'লে কি মানুষের চলে?

বাহার নাম্নী গাভীকে পাঁচ শত টাকা দিয়া উগ্রমোহন খরিদ করিয়াছিলেন। বাহারের বিশেষত্ব ছিল তাহার গায়ের রঙ—ঠিক বাঘের মত। তাহার পরিচর্যার জন্য উগ্রমোহন একটি পৃথক গোয়ালঘর এবং পৃথক পরিচারক চন্দনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

সহসা সেই বাহারের রহস্যময় অন্তর্ধানে উগ্রমোহন দমিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু চন্দ্রকান্তের কথায় তিনি বলিলেন,

না, উতলা হই নি। তোমার বাহার শুনে মনে পড়ল। এস, একদান দাবায় বসা যাক।

উভয়ে তখন দাবার ছকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিলেন। ভজনা খানসামা দুইটি গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া কপাটটা ধীরে ধীরে ভেজাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

৬

গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্র যখন শুনিলেন যে, উগ্রমোহন সিংহ রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লইয়া যম-জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়াছেন, তখন তিনি একটু চিন্তিত হইলেন ; কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চন্দ্রকান্তের নিকট গেলেন। গঙ্গাগোবিন্দ এবং চন্দ্রকান্ত উভয়ে পরম বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ দারিদ্র্যের জন্য বেশিদূর লেখাপড়া করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির দীপ্তির জন্যই বালক চন্দ্রকান্ত একদা যাচিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। সেই আলাপ কালক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং সেই বন্ধুত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

গঙ্গাগোবিন্দের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। ধনীলোকের সংস্পর্শ তিনি যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি উগ্রমোহনের অনুগ্রহ-মূলক প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন নাই, এবং এইজন্যই তিনি অকারণে চন্দ্রকান্তের নিকট বন্ধুত্বের দাবি লইয়া যখন-তখন

হাজির হইতেন না। তিনি নিজের স্বল্প আয়ে ব্যবস্থা করিয়া সংসার চালাইতেন এবং অবসর-সময়ে স্থানীয় পাঠাগার হইতে পুস্তকাদি লইয়া তাহাতেই অবসর-বিনোদন করিতেন। সুতরাং যদিও দেবী সরস্বতী তাঁহাকে পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দেখা দিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু এমন একজন ভক্তকে তিনি বেশিদিন অগ্রাহ্য করিয়াও থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃত শিক্ষার সত্য আলোকে গঙ্গাগোবিন্দ বাণীর বরলাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের সকলেই ইহা জানিতেন এবং মানিতেন। গঙ্গাগোবিন্দের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া চন্দ্রকান্তের মত মার্জিতরুচি জমিদারও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার মাঝে মাঝে দুঃখ হইত, গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার নিকট আসেন না বলিয়া। এইজন্যই কিন্তু তিনি আবার গঙ্গাগোবিন্দকে বেশি শ্রদ্ধাও করিতেন। বহুকাল পরে গঙ্গাগোবিন্দ অকস্মাৎ আসাতে চন্দ্রকান্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তুমি বাণীর কাছে একটা খবর পাঠাতে পার ?

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, চন্দ্রকান্ত, তুমি তো সব জান। কেন তবে আবার এ কথা বলছ ?

একটু হাসিয়া চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, আচ্ছা, থাক তবে। আজকের দিনটা দেখই না। আজ যদি খবর না পাও, কাল নাগাদ পাবেই। উগ্রমোহন তোমার মেয়েদের এত বেশি ভালবাসে যে, তাদের কোন অনিষ্ট হবে না, এটা ঠিক।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, তা জানি। কিন্তু আমার নিজের কষ্ট হচ্ছে যে। আচ্ছা, এ কি অত্যাচার বল তো!

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, উগ্রমোহন এখনও বালক আছে। স্কুলে, মনে নেই, সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে কি রকম দাপাদাপি করত ও?

চন্দ্রকান্ত, গঙ্গাগোবিন্দ এবং উগ্রমোহন সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু উগ্রমোহন অন্য স্কুলে পড়িতেন এবং নানা বিষয়ে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেন। সরস্বতীপূজা, দোল, দুর্গোৎসব, স্কুলের খেলাধুলা—সকল বিষয়েই উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কাহার প্রতিমা ভাল হইল, দোলের সময় কে কাহাকে কোন্ অভিনব উপায়ে রঙ দিয়া অপ্রস্তুত করিতে পারে, খেলায় কাহার দল জিতিবে—এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তের রেষারেষির অন্ত ছিল না। গঙ্গাগোবিন্দ যদিও চন্দ্রকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বাল্যকালে যদিও তাঁহার চন্দ্রকান্তের বাড়িতে অবাধ গতিবিধি ছিল; কিন্তু তিনি কখনও এই জমিদার-পুত্রদ্বয়ের ক্রীড়া-কৌতুক-কলহের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন নাই। সসঙ্কোচে তিনি বরাবর দূরেই সরিয়া থাকিতেন। এই বিনম্র স্বভাবের জন্যই উগ্রমোহনের পিতা বীরমোহনবাবু গঙ্গাগোবিন্দকে স্নেহ করিতেন এবং এত স্নেহ করিতেন যে, অবশেষে তাঁহাকে নাতজামাই-পদে বরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তের বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দ শেষে যে তাঁহার ভাগনীজামাই হইয়া পড়িবেন, ইহা উগ্রমোহন ভাবিতেও পারেন নাই।

কিন্তু পৃথিবীতে অভাবনীয় ব্যাপার অহরহ ঘটিতেছে। উগ্রমোহন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ পাইলেন, যখন তাঁহাকে চন্দ্রকান্তের ভগ্নী বাণীকে বিবাহ করিতে হইল। চন্দ্রকান্তের পিতা সূর্যকান্ত রায় বীরমোহনবাবুর পরম মিত্র ছিলেন এবং বাণীর যেদিন জন্ম হয়, সেই দিনই উগ্রমোহনের সহিত বাণীর বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। চন্দ্রকান্তও হয়তো উগ্রমোহনের ভাগিনেয়ী কমলাকে বিবাহ করিতেন; কিন্তু কোষ্ঠীবিচার করিয়া দেখা গেল যে, চন্দ্রকান্তের কোষ্ঠীতে এমন কয়েকটি গ্রহ পত্নীস্থানে বিরাজ করিতেছেন, যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতাপ কোন হিন্দুই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং চন্দ্রকান্তের বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দ কমলাকে বিবাহ করিলেন। বীরমোহন সিংহ মানুষ চিনিতেন। এই নম্র, সুশ্রী, মেধাবী যুবকের হাতে পড়িলে কমলা যে সুখী হইবে, সে বিষয়ে বীরমোহনের সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার বিচার যে নির্ভুল ছিল, তাহা উগ্রমোহন সিংহ না বুঝুন, কমলা বুঝিয়াছিলেন।

বীরমোহন এবং সূর্যকান্ত সেকালের লোক হইলেও আধুনিকমনা ছিলেন। তাহার প্রমাণ এই যে, সূর্যকান্ত নিজ-কন্যা বাণীকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য কলিকাতা হইতে জনৈকা শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া বাড়িতে রাখিয়াছিলেন। সেই শিক্ষয়িত্রী, বীরমোহন সিংহ এবং সূর্যকান্তকে জড়াইয়া এখনও স্থানীয় বৃদ্ধগণ নিম্নস্বরে যে সব আলোচনা করেন, তাহা আংশিকভাবে সত্য হইলেও বিস্ময়ের বস্তু।

গঙ্গাগোবিন্দ কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, এখন কি করা উচিত তা হ'লে ?

এখন কিছু ক'রো না। আমার মনে হয়, কাল নাগাদ একটা খবর পাবেই। ব্যস্ত কি ? রুম্‌নি-ঝুম্‌নি তাদের দাদুর কাছে আছে, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ? দাদুও যে-সে লোক নয়,—উগ্রমোহন সিংহ।

গঙ্গাগোবিন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ চলিয়া যাইবার পর চন্দ্রকান্ত খানিকক্ষণ চক্ষু মুদিত এবং দক্ষিণ করতলের উপর গণ্ড বিন্যস্ত করিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার মুখে একটা মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। তিনি উঠিয়া হাঁক দিলেন, ওরে ভজনা !

ভজনা আসিতেই তিনি হুকুম দিলেন জমাদার সীতারাম পাঁড়েকে অবিলম্বে ডাকিয়া আনিতে।

সীতারাম পাঁড়ে বৃদ্ধ জমাদার। চন্দ্রকান্তকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। চন্দ্রকান্তের চরিত্র সম্বন্ধে তাহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। সুতরাং চন্দ্রকান্ত যখন সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উগ্রমোহনের শখের বাহার নাম্নী গাভী কোথায়, কি ভাবে এবং কাহার জিম্মায় আছে, তখনই সীতারাম ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু কিছু বলিল না। চন্দ্রকান্ত যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া বৃদ্ধ সীতারাম সহাস্যদৃষ্টিতে মিটিমিটি

চন্দ্রকান্তের দিকে তাকাইতে লাগিল। ভাবা যেন, তোমার আবার একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়াছে, বুঝিয়াছি আমি।

চন্দ্রকান্ত অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেরাজ হইতে দুই শত টাকার নোট বাহির করিয়া সীতারামের হস্তে দিয়া মৃদুস্বরে সংক্ষেপে বলিলেন, যা লাগে খরচ ক'রো, আজ সন্ধ্যের আগে বাহারকে বেমালুম সরানো চাই। আমি এর ভেতরে আছি, তা কিছুতেই যেন প্রকাশ না পায়।

প্রত্যেক বারই চন্দ্রকান্ত এই জাতীয় ছোটখাটো কার্যে সীতারামের সহায়তা লন। ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি সকলের নিকটই চন্দ্রকান্ত রায় গম্ভীর প্রকৃতির বুদ্ধিমান জমিদার। কিন্তু সীতারামের নিকট তিনি এখনও বালক মাত্র। শুধু তাই নয়, এই শ্যামকান্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকের মধ্যে সীতারাম নিজের আরাধ্য দেবতা নবদূর্বাদলশ্যাম রামজীকে যেন দেখিতে পাইত। তাই স্নেহ-ভক্তি-ভয়-মিশ্রিত আগ্রহে প্রভুর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত সে।

অর্থের লোভ দেখাইলে পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে কি না জানি না, খঞ্জ চন্দন-গোয়ালা মাত্র এক শত টাকার লোভে ছাপরা জেলায় চলিয়া যাইতে রাজী হইয়া গেল এবং ট্রেন ধরিবার জন্য দশ ক্রোশ দূরবর্তী রেলওয়ে স্টেশনের অভিমুখে অবিলম্বে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। রক্ষকবিহীন বাহার সীতারামের নিয়োজিত সাঁওতাল মজুর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া উগ্রমোহনের জমিদারি ত্যাগ করিল।

কিছুক্ষণ পরে সীতারাম আসিয়া প্রভুকে নব্বুই টাকা ফেরত দিয়া কহিল যে, চন্দনদাস ছাপরা জেলায় চলিয়া গিয়াছে। এক শত টাকা লইয়া সেখানে সে নিজের ক্ষেত-খামার করিবে। বাহার গাভীকে টাল নামক জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া আসিবার জন্য দুইজন সাঁওতাল মজুরকে দশ টাকায় নিয়োগ করা হইয়াছে।

টালা নামক বনকরটি চন্দ্রকান্ত রায়ের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। যম-জঙ্গলের মত ইহাও একটি নিবিড় ও দুর্গম বনভূমি।

সীতারাম চলিয়া যাওয়ার পর গোমস্তা রাধিকামোহন আসিয়া প্রণাম করিল। রাধিকামোহন পূর্বনির্দেশমত গোলোক সাহার নিকট টাকা আনিতে গিয়াছিল।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা পেয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তহবিলে জমা ক'রে দাও।

গোলোক বলছিল যে, পীরপুরের বাসাটা—

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, হ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দাও। আমার কাছে হুকুম নিয়েছে। বাসার চাবি দিয়ে দাও ওকে।

রাধিকামোহন চলিয়া গেলে পুলকিত চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ওরে ভজনা, তামাক দে, আর মিশিরজীকে একবার ডেকে দে তো।

মিশিরজী আসিলে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, ওস্তাদজী, বাহার একটা শোনান তো।

খালি বাহার, না, বসন্ত-বাহার ?

খালি বাহার।

ওস্তাদজী বাহার আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপ করিবার পূর্বে অবশ্য তিনি চন্দ্রকান্তকে বলিলেন যে, বাহারের সম্পূর্ণ জাতি, নি কোমল লাগে এবং ইহাই তাহার ঠাটের বিশেষত্ব। বিবাদী কিছু নাই, মা অর্থাৎ মধ্যম সম্বাদী।

চন্দ্রকান্ত যত্নসহকারে শিক্ষা করিলেন।

সব বনমে কৈসে শোহে ঋতুরাজ দিন আই,
মন্দ মন্দ পবন বহত বহু বরণ হোয় সুমন।
কোয়েলা পাপিহাঁ বনমে, ধরত নেক নেক তান
ভ্রমর সব গুঞ্জরাত, কহন যা ত রহ লগন।

গানের সুরে সুরে বসন্তের বর্ণনা মূর্ত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এই গান লইয়াই চন্দ্রকান্ত রহিলেন। সন্ধ্যার পর উগ্রমোহন আসিলেই তাঁহাকে গানটা শুনাইয়া দিলেন এবং ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে বাহার নাম্নী গাভী হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাহার সুর একবার আয়ত্ত করিলে সহজে পলাইয়া যাইবে না। উগ্রমোহন এতটা বুঝিলেন কি না ভগবানই জানেন, কিন্তু তিনি বাড়ি গিয়া যাহা করিলেন, তাহাতে রাণী বহ্নি দেবী বিস্মিত হইয়া গেলেন।

৭

উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে যখন ফিরিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। চন্দ্রকান্তের বাহার আলাপ শুনিয়া অবধি তাঁহার সর্বশরীরে আগুন ছুটিতেছিল। দাবাখেলায় যদিও তিনি জিতিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্রোধ কিছুমাত্র কমে নাই। তাঁহার সাধের গাভীকে যে চন্দ্রকান্তই চক্রান্ত করিয়া সরাইয়াছে, তাহাতে উগ্রমোহনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাহার গাভীকে অপহরণ করিয়া তাঁহাকে বাহার রাগের আলাপ শুনাইয়া দেওয়ার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল, তাহা উগ্রমোহনের পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত। সুতরাং সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর তিনি যখন পালকি হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত মন তিক্ত।

মৃন্ময় ঠাকুরের বাড়ি হইতে ফিরিবার সময় আকাশপটে চন্দ্রের পার্শ্বে স্বাতীকে দেখিয়া তাঁহার মনে যে কোমলতার সঞ্চার হইয়াছিল, যাহার ফলে তিনি চাবুক চালনা করিয়া অশ্বের গতিবেগ বাড়াইয়াছিলেন, চন্দ্রকান্তের সংস্পর্শে আসিয়া তাহা লোপ পাইয়াছে। দারুণ ক্রোধে তাঁহার সমস্ত অন্তর পুড়িয়া যাইতেছিল। চন্দ্রকান্ত এবং চন্দ্রকান্তের সম্পর্কে যে কেহ আছে, সকলকে আঘাত করিলে তবে যেন তিনি কতকটা শান্তি পাইবেন—মনের এই অবস্থা।

তিনি বাড়ি ফিরিতেই তাঁহার খাস-চাকর ব্রজ আসিয়া নিবেদন করিল যে, অন্দরমহল হইতে রাণীমা তাঁহার সম্বন্ধে বারংবার খোঁজ করিয়াছেন।

উগ্রমোহন কোন উত্তর না দিয়া সোজা অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, রাণী বহ্নিকুমারী তাঁহার প্রত্যাশায় বসিয়া এস্রাজ আলাপ করিতেছেন, সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে। এস্রাজ দেখিয়া উগ্রমোহনের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু ভ্রূকুটি করিলেন। বহ্নিকুমারী এস্রাজ সরাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আজ 'ঋতু-সংহার'-এর কথা মনে হচ্ছিল, "প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ"। কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

উগ্রমোহন কোন উত্তর না দিয়া পাগড়িটা নামাইয়া রাখিলেন এবং বহ্নিকুমারীর সম্মুখে বসিলেন। এস্রাজটার দিকে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া বহ্নিকুমারী বলিলেন, একখানা দেশের গান বাজাচ্ছিলাম অনেক দিন পরে। শুনবে ? গানটা হচ্ছে—

বৈরন, কোয়লিয়া কুহুক ঘরি ঘরি কুহুক—

বলিয়া তিনি বাজাইতে উদ্যত হইলে উগ্রমোহন বলিলেন, দেখি তোমার যন্তরটা।

এস্রাজটা বহ্নিকুমারী উগ্রমোহনের হাতে দিতেই উগ্রমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া গিয়া জানালা দিয়া সেটি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর সংক্ষেপে বলিলেন, আমি আজ নীচের ঘরে শোব।

বহ্নিকুমারী কিছু বলিলেন না; কিন্তু শুধু চাহিয়া রহিলেন—সেই নিষ্পলক ভাষাময় চাহনি।

উগ্রমোহন আবার কথা কহিলেন। বলিলেন, গান গায় পাখিতে, মানুষে নয়।

বহ্নিকুমারী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, তোমার গায়ে বেশ জোর আছে তো।

তাঁহার চক্ষু দুইটিতে বিদ্রূপের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

উগ্রমোহন নীচে নামিয়া গেলেন।

বহ্নিকুমারী একটু হাসিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

উগ্রমোহন নীচে নামিয়া গেলেন, নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শয়ন করিলেন না। শয়নকক্ষের দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া তিনি পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে এক চিন্তা—চন্দ্রকান্তকে সমুচিত একটা জবাব দিতে হইবে।

একা অন্ধকার রজনীতে নির্জন শয়নকক্ষে উগ্রমোহন সিংহ পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কত কথা মনে হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তকে জব্দ করিয়া দেওয়া কি এতই শক্ত ব্যাপার? সেদিন চন্দ্রকান্ত উগ্রমোহনের একটা জলকর লুণ্ঠন করিয়াছে। চন্দ্রকান্ত কি মনে করে যে, উগ্রমোহন তাহা পারেন না? মাছগুলা আবার পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইদিনই উগ্রমোহনের ইচ্ছা হইয়াছিল যে চন্দ্রকান্তের সমস্ত

জলকরগুলা নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করেন ; কিন্তু কেন জানি না, সে প্রবৃত্তি বেশিক্ষণ থাকে নাই। তাহার কারণ বোধ হয় রাত্রে লুকাইয়া লুঠ করা তিনি চৌর্যবৃত্তি মনে করিতেন। উগ্রমোহন সিংহ আর যাই হউন, তস্কর নহেন। যদি কাহারও কোন জিনিস কাড়িয়া আনিতেই হয়, তাহা অন্ধকারে লুকাইয়া লইয়া আসাটা পুরুষোচিত নহে। যদি লইতেই হয়, দিবালোকে ছিনাইয়া লইতে হইবে, তাহাতে বরং খানিকটা বীরত্ব আছে। ইহাই তিনি চন্দ্রকান্তকে দেখাইয়া দিতেন ; কিন্তু রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ব্যাপারে তাঁহাকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, তিনি এদিকে আর মনোযোগ দিবার অবসর পান নাই। কিন্তু আজ এই বাহার-অপহরণের ব্যাপারটা—বিশেষ করিয়া বাহারের আলাপটা, তাঁহার গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। ইহার একটা রীতিমত প্রতিবিধান না করিলে উগ্রমোহন সিংহ পাগল হইয়া যাইবেন।

কি করা যায়? উগ্রমোহন গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অধীরভাবে পায়চারি করিতেছেন। তেমন কোন মনোমত উপায় মনে আসিতেছে না। আস্তাবল হইতে চন্দ্রকান্তের ঘোড়াগুলি সরাইয়া দিবেন? প্রস্তাবটা মনে হইতেই উগ্রমোহনের সমস্ত অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ছি ছি, ঘোড়া চুরি! চন্দ্রকান্ত গরু চুরি করিতে পারে, কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

পায়চারি করিতে করিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সহসা উগ্রমোহন দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঠিক তো, একথাটা এতক্ষণ

মনে পড়ে নাই কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একগোছা চাবি বাহির করিলেন। আলোর নিকট লইয়া গিয়া সেই চাবির গোছা হইতে মরিচা-পড়া একটা চাবি বাছিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুদূর যাইতেই একজন দীর্ঘকায় আসাসোঁটাধারী লোক আসিয়া উগ্রমোহনকে আভূমি প্রণত হইয়া অভিবাদন করিল। হাবেলির নৈশপ্রহরী। উগ্রমোহন তাহাকে লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া সিধা অন্দরমহলের দেউড়ী পার হইয়া খাজাঞ্চিখানার দিকে অগ্রসর হইলেন। খাজাঞ্চিখানার তোরণেও একজন বন্দুকধারী পাহারা ছিল। এই অসময়ে প্রভুকে দেখিয়া সে সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন খাজাঞ্চিখানার দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। তিনি বাহিরে আসিয়া প্রহরীকে একটা আলো আনিতে বলিলেন। আলো আসিলে উগ্রমোহন ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। বিস্মিত প্রহরী প্রভুর এই অদ্ভুত আচরণে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ঘণ্টা-ঘরে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

উগ্রমোহন ভিতরে গিয়া বড় লোহার সিন্দুকটা খুলিলেন। সিন্দুক খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা বড়-গোছের ক্যাশ-বাক্স বাহির করিয়া নিকটস্থ তক্তাপোশের উপর রাখিলেন। তারপরে ক্যাশ-বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা ছোট রূপার বাক্স বাহির করিলেন। রূপার বাক্সটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া উগ্রমোহন সিংহ সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

গোলাপী রঙের একখানি কাগজ। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মন নিমেষের মধ্যে দশ বৎসর পার হইয়া অতীতে ফিরিয়া গেল। তখন চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহনের সবে যৌবন-উন্মেষ হইয়াছে, চিঠি পড়িতে পড়িতে উগ্রমোহন যেন রেশমকে দেখিতে পাইলেন। আজ উগ্রমোহন সিংহ রেশমকে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু একদিন এই রেশমের স্বপ্ন উগ্রমোহনের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া উগ্রমোহনের সমস্ত মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পত্রখানি সযত্নে মেরজাইয়ের পকেটে রক্ষা করিয়া তিনি রূপার বাক্স ক্যাশ-বাক্সের মধ্যে এবং ক্যাশ-বাক্সটি লৌহসিন্দুকে পুনরায় রাখিয়া সিন্দুকটি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং খাজাঞ্চিখানার দ্বারদেশে যথারীতি তালা লাগাইয়া আবার নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। অজানা ফুলের গন্ধ বহিয়া তীব্র শীতের বাতাস তখন অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

উগ্রমোহন শয়নকক্ষে ফিরিলেন বটে, কিন্তু ভিন্ন মূর্তিতে তাঁহার প্রথম যৌবনের প্রিয়া রেশমও যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। প্রথম যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন ফিরিয়া আসিল। প্রথম যৌবনের বাসন্তী-কুঞ্জে আবার পিক কুহরিয়া উঠিল।

এই গভীর নিশীথে উগ্রমোহনের মানস-পটে ছায়াছবির মত কত কি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কে বলে, অতীত মৃত? অতীত চিরঞ্জীব। অতীতের প্রাণরসের অমৃতধারা পান করিয়া

নিত্যপরিবর্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর বর্তমান বাঁচিয়া আছে। পরিবর্তনের দাবি মিটাইতে গিয়া বর্তমান মুমূর্ষু। স্মৃতির সুধা পান করিয়া অতীত অমরত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার মৃত্যু নাই।

উগ্রমোহন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রেশম কি আজও বাঁচিয়া আছে? বর্তমানে রেশম বলিয়া হয়তো কেহ বাঁচিয়া নাই, কিন্তু অতীতের রেশম যে জীবন্ত! হাসিতে গেলে তাহার গালে যে টোল খাইয়া যাইত, সেটুকু পর্যন্ত এখনও বাঁচিয়া আছে। চলিয়া যাইবার দিন রেশম যে কাঁদিয়াছিল, তাহার সেই অশ্রুধারা এখনও তো শুকায় নাই! তাহার সাবলীল নৃত্যভঙ্গীর নূপুর-গুঞ্জন এখনও যে উগ্রমোহনের অন্তরলোকে গুঞ্জরিয়া ফিরিতেছে। সবিস্ময়ে উগ্রমোহন দেখিলেন, নানা বেশে, নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে রেশম বাইজী তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন-লোকে লুকাইয়া ছিল, সহসা যাদুমন্ত্রে বর্তমানের যবনিকা সরিয়া গেল, রেশম বাইজী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—মুখে সেই মৃদু হাসি, সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া সেই সবুজ ওড়না, সুর্মা মাখানো ডাগর চোখ দুইটিতে সেই রহস্যা-ভাস, অঙ্গে অঙ্গে নৃত্যচটুল সেই লীলাভঙ্গী। মুগ্ধ উগ্রমোহন দেখিতে লাগিলেন। মনে পড়িল গভীর রাত্রে অশ্বারোহণে সেই উন্মুখ অভিসার। সূর্যোদয়ের পূর্বে সুগোপন প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু রেশম থাকে নাই। ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, উগ্রমোহনের সমস্ত কল্পনা ও স্বপ্ন ব্যর্থ করিয়া। বহুকাল পরে আজ আবার সে ফিরিয়াছে। উগ্রমোহন একদৃষ্টে

গোলাপী কাগজটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটা মৃদু হাস্য তাঁহার অধরে ফুটিয়া উঠিল। সচ্চরিত্র চন্দ্রকান্তের চরিত্র-সৌরভে আজিও সকলে পুলকিত।

রেশম যেদিন চলিয়া যায়, সেদিন এই পত্রখানি উগ্রমোহনকে দিয়া গিয়াছিল। তাহার হাতের স্পর্শ এখনও যেন ইহাতে লাগিয়া আছে। রেশমের মিনতিভরা চোখ দুইটি মনে পড়িল।—ইহা লইয়া তোমরা দুইজনে ঝগড়া করিও না, আমার অনুরোধ।—বলিয়া সে এই পত্র উগ্রমোহনের হস্তে দিয়াছিল। উর্দুতে লেখা চন্দ্রকান্তের পত্র—প্রেমপত্র। একটি আতর-সুগন্ধি গোলাপী কাগজে কবিত্বময় ভাবে ও ভাষায় চন্দ্রকান্ত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে রেশমকে প্রেম নিবেদন করিয়াছে। পত্রের মধ্যে একটি ফার্সী বয়েৎও রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত লিখিয়াছে—হে সুন্দরী, কাননে গোলাপ ফোটে, সে কি কেবল একটি ভ্রমরের জন্য? পূর্ণিমার অপরূপ জ্যোৎস্না কি একটি চকোরের জন্যই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বিরহী অলিগণের উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে গোলাপ শুকাইয়া যাইত, হতাশ চকোরদের বিরহের কৃষ্ণমেঘে চন্দ্রমা অবলুপ্ত হইত। যাহা অনবদ্য, যাহা অসাধারণ, তাহা সকলের জন্য। আমার অন্তর পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ অন্তরের সমস্তটা উজাড় করিয়া না দিলে তৃপ্তি পাইতেছি না। তুমি এস। তোমার জন্য উন্মুখ আগ্রহে বসিয়া আছি। সম্রাট শাহজাহানের রচিত একটি বয়েৎ মনে পড়িতেছে—

আগর বে-খবর-ম্ জুদ্ দর আয়ি, চে শাওয়াদ্ ?
মানন্দ্-এ-নছীম্ এ সহর আয়ি, চে শাওয়াদ্ ?
হর-চন্দ্ কে বু-এ-গুল্ জে গুল্ আয়েদ পেশ
আর গুল্ তু জে-বু পেশতর, আয়ি, চে শাওয়াদ্ ?

প্রভাত-সমীরণের মত তুমি কোন খবর না দিয়েই এস। ফুলের গন্ধ ফুলের আগে আগে যায় বটে, কিন্তু ফুলই যদি আগে আসে তাতে ক্ষতি কি ?

বিদায়কালে রেশমের চক্ষে যে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছিল, তাহা যেন উগ্রমোহন এখনও দেখিতে পাইতেছেন। চন্দ্রকান্তের পত্র পাইয়াই রেশম চলিয়া গিয়াছিল, আর সে ফিরিয়া আসে নাই। রেশমের বিরহে উগ্রমোহন দশ দিক অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। এই চিঠি লইয়া চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তখন কলহ করার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় নাই। তাহার পর দশ বৎসর ধরিয়া কালের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, কত ঘূর্ণাবর্ত কত কি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, উগ্রমোহন রেশমকে ভুলিয়াছেন।

চন্দ্রকান্তের এই পত্র এতদিন উগ্রমোহনের কাছেই সযত্নে রক্ষিত ছিল। আজ সহসা উগ্রমোহনের এই পত্রখানার কথা মনে পড়িয়াছে। ঠিক করিয়াছেন, পত্রখানাকে এইবার কাজে লাগাইবেন। পত্রখানা প্রকাশ করিয়া দিলে চন্দ্রকান্তের সম্মানের প্রভূত ক্ষতি উগ্রমোহন করিতে পারেন। কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ সিংহই, শৃগাল নহেন। তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন চিঠি লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—

ভাই চন্দ্রকান্ত,

তুমি একদা রেশমকে যে প্রণয়লিপি লিখিয়াছিলে. তাহা এতদিন আমার কাছেই ছিল। পুরাতন বাক্স খুলিয়া অদ্য তাহা বাহির করিলাম। দশ বৎসর পূর্বে ইহা লইয়া আমি ও রেশম বহু হাসাহাসি করিয়াছি। এখন আর ইহাতে হাসিবার কিছু নাই। তাহা ছাড়া, তোমার উচ্ছ্বাস তোমার বাক্সে থাকাই শোভন বিবেচনা করি।

উগ্রমোহন

সীলমোহর করিয়া পত্রটি নৈশ প্রহরীর হস্তে দিয়া আদেশ করিলেন, খুব ভোরেই চিঠিখানি চন্দ্রকান্তবাবুকে দিয়া আসা চাই।

তাহার পর উগ্রমোহন খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সামনের বাগানে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রেশমের কথা, রেশমের মুখ, রেশমের ভঙ্গিমা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। কত কথাই না মনে হইল! রেশমের খোঁজ পান নাই। কলিকাতার সেই এক মাস প্রবাসের কথা মনে করিয়া উগ্রমোহনের সর্বদেহ ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। এলোমেলো নানা চিন্তা মনে আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ একাকী পদচারণা করিয়া যখন তিনি শুইতে যাইবেন, তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়া আছে, রেশম নয়,—রাণী বহ্নিকুমারী। উজ্জ্বল চক্ষু দুইটিতে সহাস্য কৌতুক-দীপ্তি।

আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চাঁদ অস্ত যাইতেছে, স্বাতী পাশটিতেই আছে।

পরদিন প্রভাতে ভৃত্য ব্রজলাল প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে আসিয়া দেখিল যে, উগ্রমোহন অঘোরে ঘুমাইতেছেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে একটি ভাঙ্গা এস্রাজ রহিয়াছে।

সে আর ঘুম ভাঙাইতে সাহস করিল না।

৮

বেলা প্রায় দশটার সময় উগ্রমোহন সিংহ বহির্বাটীতে আসিয়া বসিলেন। মন,বেশ প্রসন্ন। দুইজন প্রজার খাজনা মাফ করিয়াছেন। আর একজন প্রজা তাহার করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া চলিয়াছে, তিনি সহানুভূতির সহিতই তাহা শুনিতেছেন। প্রজাটি বলিতেছিল যে, শীঘ্রই তাহার কন্যার বিবাহ হইবে, হাতে টাকা কম, ফসলও যে খুব সুবিধাজনক হইয়াছে তাহা নয়। তাহা ছাড়া সম্প্রতি বাজার এমন মন্দা পড়িয়া গিয়াছে যে, ষোল-আনা ফসল হইলেও কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলিতে পারে। এ অবস্থায় হুজুর দয়া না করিলে উপায় নাই।

উগ্রমোহন সটকায় একটা মৃদু-গোছের টান দিয়া বলিলেন, কবে তোর মেয়ের বিয়ে ?

আর দিন কই হুজুর ?

আমাকে নেমন্তন্ন করবি না ?

দরিদ্র প্রজা একটু থতমত খাইয়া গেল। 'না' বলিতেও তাহার সাহসে কুলায় না, অথচ উগ্রমোহন সিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়া সে কি খাইতে দিবে, কোথায় বসিতে দিবে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল, গরিবের কুঁড়েঘরে হুজুরের পায়ের ধূলো যদি পড়ে, সে তো আমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই করব। করব কেন, করলাম, যাবেন দয়া ক'রে।

কবে তোর মেয়ের বিয়ে? কোন্ তারিখে?

তেইশে মাঘ।

তারিখটা শুনিয়াই তাঁহার রুম্‌নি-ঝুম্‌নির কথা স্মরণ হইল।

দেওয়ানজীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেওয়ানজী, গঙ্গাগোবিন্দ বাড়িতে আছে কি না, একবার খবর নিন তো।

তাহার পর প্রজাটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোর খাজনা কিছু মাপ ক'রে দিলাম। বকেয়া বাকি যা আছে, তা আর দিতে হবে না। হালের যা বাকি পড়েছে, তাই দিলেই ফারক পাবি। ওহে অক্ষয়!

অক্ষয় নামক গোমস্তাটি আসিয়া দাঁড়াইতেই উগ্রমোহন সিংহ বলিলেন, এর মেয়ের বিয়ের দিন আধ মন দই আর আধ মণ মাছ এর বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। তার সঙ্গে এক জোড়া ভাল শাঁখা, রূপোর সিঁদুরকৌটো, ভাল একখানা শাড়ি, কিছু ধান আর দূর্বা পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিও। নানা কাজে আমি ভুলে যেতে পারি।

এমন সময় একজন সিপাহী আসিল—চন্দ্রকান্তের সিপাহী।

সেলাম করিয়া একখানি পত্র সে উগ্রমোহনের হস্তে দিল।

পত্র খুলিয়া উগ্রমোহন পড়িলেন—

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া পরম সুখী হইলাম। তোমার যে এমন সূক্ষ্ম রসবোধ এখনও আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া সত্যই পুলকিত হইয়াছি। কিছুদিন পরে সেতারী মীর সাহেবের আসিবার কথা আছে। লক্ষ্ণৌ হইতে একজন ভাল নর্তকীও আনাইব মনস্থ করিয়াছি। পুরাতন প্রসঙ্গ আবার আলোচনা করিবে নাকি? ভাল কথা, সেবার কলিকাতায় গিয়া রক্তদুষ্টির জন্য চিকিৎসাদি করাইয়াছিলে বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহার ব্যবস্থাপত্রগুলি কি করিয়া আমার বাক্সে স্থান পাইয়াছে। এগুলি তোমারই কাছে থাকা সঙ্গত মনে করিয়া এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

চন্দ্রকান্ত

পত্রখানি পাঠ করিবামাত্র উগ্রমোহনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। যদিও তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সহাস্য-মুখে সিপাহীটিকে বলিলেন, আচ্ছা যাও, বাবুজীকো হামারা সেলাম কহনা। কিন্তু তিনি উঠিয়া পড়িলেন। আত্মসংবরণ করিয়া সেখানে বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি খাস-কামরার মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ক্রোধে ক্ষোভে আবার তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কলিকাতা-প্রবাসের কথা তাঁহার মনে পড়িল। যৌবনের উন্মাদনায়, রেশমের বিরহে, হয়তো বা—। নাঃ, এতদিন পরে

কার্যকারণের পারম্পর্য ঠিকমত আলোচনা করিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহার ছিল না। তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপিয়া কলিকাতার একটা বীভৎস স্মৃতি পচা পাঁকের মত ভটভট করিতে লাগিল। তাহা কেবল পাঁকই, পঙ্কজ সেখানে নাই—দুঃসহ গ্লানিকর পাঁক। উন্মত্ত আবেগে উগ্রমোহন একদা সেই পঙ্কস্নান করিয়াছিলেন। তাহার ফলভোগও করিয়াছিলেন, অত্যন্ত মোটা রকম দক্ষিণা দিয়া প্রায়শ্চিত্তও তিনি করিয়া আসিয়াছেন। এতদিন সেজন্য তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। দুর্দান্ত যৌবনের ক্ষুধিত কামনা মিটাইতে গিয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে অপুরুষোচিত বা কাপুরুষোচিত কিছু ছিল না। প্রথমে যখন ঘোড়ায় চড়া শিখিতে যান, তখনও তো পড়িয়া গিয়া কতবার কত আঘাত পাইয়াছেন। শূকর শিকার করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে একটা মানুষকেই তিনি একবার গুলি করিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসের দুষ্কৃতিগুলিও অনুরূপ ঘটনা।

কিন্তু আজ সহসা এই ব্যবস্থাপত্রগুলি চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে পাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিল। তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র চন্দ্রকান্ত পাইল কি করিয়া? নিষ্ফল আক্রোশে উগ্রমোহন ফুলিতে লাগিলেন। এমন সময় গলার মৃদু আওয়াজ করিয়া কে যেন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল মনে হইল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

আজ্ঞে হুজুর, আমি।—বলিয়া একটি খর্বাকৃতি লোক দ্বারদেশে দেখা দিল এবং অতিশয় ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ও, মানিক মণ্ডল। কি খবর? এস, ভেতরে এস।

মানিক মণ্ডল লোকটিকে উগ্রমোহন একটু অনুগ্রহ করেন, তাহার কারণ মানিক মণ্ডল তাঁহার গুপ্তচর—ইংরেজীতে যাহাকে বলে, স্পাই। এ খবর অবশ্য বাহিরের লোকে জানে না।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন নতুন খবর আছে নাকি? মানিক মণ্ডলের সহিত যদি কোন পশুর সাদৃশ্য থাকে, তবে তাহা মূষিকের। ক্ষুদ্র সূচালো মুখ। নাকটি ছোট, কিন্তু তীক্ষ্ণ। চক্ষু দুইটিও অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত চঞ্চল। উগ্রমোহনের কথায় সে পীতাভ এক পাটি দাঁত বাহির করিয়া কহিল, নতুন খবরটা কি হুজুরের এখনও কর্ণগোচর হয় নি? আমি কদিন একটু অসুস্থ ছিলাম ব'লে—

অধীরভাবে উগ্রমোহন বলিলেন, ভণিতা রাখ। খবরটা কি, তাই সোজা ক'রে বল।

গোলোক সা চন্দ্রকান্তবাবুর জমিদারিতে উঠে গিয়ে বাস করছে।

তাই নাকি? চন্দ্রকান্তকে টাকা ধার দিয়েছে, জান?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বইকি। রাধিকামোহন এসে টাকা নিয়ে গেছে, সে খবরও আমি পেয়েছি।

গোলোক সা কোথায় আছে এখন?

পীরপুরে। চন্দ্রকান্তবাবুরই একটা বাসা ছিল—

রাখালবাবু!—উগ্রমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন।

গতিক খারাপ দেখিয়া মানিক মণ্ডল কথা অর্ধসমাপ্ত

রাখিয়াই ত্বরিতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। রাখালবাবু আসিতেই উগ্রমোহন বলিলেন, যম-জঙ্গলে এখন কত সিপাহী মোতায়েন আছে ?

পঞ্চাশজন।

এখানে এখন কতজন আছে ?

এখানেও জনা-পঞ্চাশেক হবে।

তুধনাথ পাঁড়েকে ডেকে দিন।

রাখালবাবু চলিয়া গেলেন। উগ্রমোহন চক্ষু বুজিয়া খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তুধনাথ পাঁড়ে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন হুকুম দিলেন, কাল সকালে বিশ-পঁচিশজন সিপাহী নিয়ে চন্দ্রকান্তবাবুর জলকর বাঘাড় বিল লুঠ করা চাই। খুন-জখম যা হয় কুছ-পরোয়া নেই। গায়ে প'ড়ে ঝগড়া ক'রে ফৌজদারী দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে। মোট কথা, বাঘাড় বিলে কাল রক্তের স্রোত ব'য়ে যাওয়া চাই।

যো হুকুম।—বলিয়া তুধনাথ পাঁড়ে চলিয়া গেল। তুধনাথ পাঁড়ের একখানি হাত নাই। জমিদারী ব্যাপারে কিছুদিন পূর্বে চন্দ্রকান্ত রায়ের সহিত উগ্রমোহনের ভীষণ দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় তুধনাথ পাঁড়ের দক্ষিণ হস্তটি কাটা যায়, এবং সেই দাঙ্গাতেই স্বয়ং উগ্রমোহন একটি দাঁতাল হাতীর দাঁতে বড় বড় তুইটি বাঁশ বাঁধিয়া ডাঙশ মারিতে মারিতে সেই বিপুলকায় হস্তীকে চন্দ্রকান্তের বাহিনীর বিরুদ্ধে চালিত করিয়া যুদ্ধজয় করেন। তুধনাথ পাঁড়ে চলিয়া গেলে উগ্রমোহন তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে হুকুম দিয়া অন্দর-মহলের দিকে চলিয়া গেলেন।

৯

আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর রাখাটা যতদূর হাস্যকর, জাহাজের ব্যাপারীর পক্ষে আদার খবর রাখাটা ততদূর নহে। কাহারও কাহারও নিকট ইহাই হয়তো বিস্ময়ের বস্তু। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ লইয়া যাঁহার কারবার, আদা-জাতীয় সামান্য দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইলে আমরা স্বভাবতই তাঁহার প্রতিভার সর্বতোমুখী প্রসার দেখিয়া মুগ্ধ এবং বিস্মিত হই।

চালভাজা খাওয়াটা এমন কোন বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে; কিন্তু যখনই আমরা শুনি, অমুক মহারাজাধিরাজ চালভাজা খাইতে ভালবাসেন কিংবা আমেরিকার অমুক কোটিপতি সুন্দররূপে জুতা বুরুশ করিতে পারেন, অমনই চমৎকৃত হইয়া যাই।

সুতরাং জমিদার উগ্রমোহন সিংহের প্রকাণ্ড জমিদারির সুদক্ষ ম্যানেজার অঘোরবাবুকে রুম্‌নি-ঝুম্‌নির সহিত ছেলেমানুষের মত লুকাচুরি খেলিতে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন।

অঘোরবাবুর শিশুমনস্তত্ত্বে যে এতখানি পারদর্শিতা ছিল, তাহা বোধ করি তিনি নিজেও জানিতেন না। কিন্তু 'ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে' নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি শিশুমনোরঞ্জনে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োগ করিয়াছেন এবং আবিষ্কার করিয়াছেন যে, জটিল মকদ্দমায় জয়লাভ করিতে হইলে যে

ধরনের বুদ্ধিকৌশল প্রয়োজন, শিশুহৃদয় জয় করিতে হইলে সে সবের প্রয়োজন হয় না বটে; কিন্তু ইহাতেও কৌশলের প্রয়োজন আছে, যদিও তাহা বিভিন্ন জাতীয়। সুতরাং লুকাচুরি, কানামাছি প্রভৃতি খেলার আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং ইহাতে তিনি কৃতকার্যও হইয়াছেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি অঘোরবাবুকে লইয়া সমস্ত দিন হৈ-চৈ করিতেছে।

অঘোরবাবু আয়োজনের কোনও ত্রুটি করেন নাই। সম্মুখস্থ তিনটি বড় বড় বৃক্ষে তিনটি দোলনা টাঙানো হইয়াছে। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি এবং অঘোরবাবু তিনজনে পাল্লা দিয়া তাহাতে দোল খাইয়া থাকেন। কোথা হইতে একটি বাঁদরছানাও তিনি যোগাড় করিয়াছেন, নিমগাছটার শিকড়ের সঙ্গে শিকল দিয়া বাঁধা আছে। এই জীবটির নানাবিধ মুখভঙ্গী রুম্‌নি-ঝুম্‌নির পক্ষে পরম কৌতুকের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। খরগোশটি তো আছেই। তাহার জন্য নূতন একটি খাঁচাও নির্মিত হইয়াছে। দুই জোড়া পারাবতও জুটিয়াছে। তাহাদের বক্‌বকম্‌ ধ্বনিতে কাছারি-বাড়ির প্রাঙ্গণ মুখরিত।

অঘোরবাবু লোকটিকে দেখিলে মনে হয় না যে, তাঁহার মধ্যে এতটা তরল মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। ভদ্রলোকের গায়ের বর্ণ ঘোর কালো। মুখখানা লম্বা-গোছের, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, পাথরের তৈয়ারি। অভিব্যক্তিবিহীন মুখের উপর মনের কোন ছাপ নাই। এক জোড়া ঝোলা তামাটে রঙের গোঁফ থাকাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে আরও ভয়ঙ্কর এবং বেরসিক বলিয়া বোধ হয়। অঘোরবাবু একজন তান্ত্রিক

কালী-সাধক। এখনও মধ্যে মধ্যে চামাপ্রান্তরস্থিত মহাকালীর মন্দিরে গিয়া অমাবস্যায় তিনি কালীপূজা করেন। কিন্তু তিনি যে এমন নিখুঁতভাবে মোরগের ডাক ডাকিতে পারেন, তাহা এতকাল কেহ জানিত না। শুধু মোরগ কেন, মুখে চাদর ঢাকা দিয়া বিড়াল ও কুকুরের ঝগড়া তিনি এমন সুন্দরভাবে দেখাইতে পারেন যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও রুম্‌নি-ঝুম্‌নি অঘোরবাবুকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বাবার কাছে কবে ফিরে যাব, বল না! স্তোকবাক্যে অঘোরবাবু অপটু নহেন, সুতরাং দিন মন্দ কাটিতেছিল না। এত অজস্র আমোদপ্রমোদ রুম্‌নি-ঝুম্‌নির জীবনে এই প্রথম।

সেদিন প্রাতঃকালে কুমীর-কুমীর খেলা হইতেছিল। অঘোরবাবু প্রাঙ্গণের মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়া কুম্ভীর সাজিয়া বসিয়া ছিলেন। চক্ষু দুইটি অর্ধমুদিত। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি প্রাঙ্গণস্থিত একটি উচ্চ চৌতারাকে ডাঙা কল্পনা করিয়া তদুপরি দাঁড়াইয়া ছিল এবং সুযোগমত কুম্ভীর-রূপী অঘোর-বাবুকে খোঁচা দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছিল। অঘোরবাবুও তাহাদের ধরিতে না পারার ভান করিয়া ছদ্ম-ক্রোধে হাউ-মাউ করিয়া গর্জাইতেছিলেন, এবং তাহা দেখিয়া রুম্‌নি-ঝুম্‌নি কলহাস্যে লুটাইয়া পড়িতেছিল। খেলা বেশ জমিয়াছে, এমন সময় ভিখন তেওয়ারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, খরগোশটি পলাইয়াছে, খাঁচার দরজা খোলা ছিল।

অকস্মাৎ এই মর্মান্তিক সংবাদ শ্রবণে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অঘোরবাবু এমন একটা মুখভাব করিলেন, যেন জমিদারির একটা মৌজা বেদখল হইয়া গিয়াছে। তিনজনেই ঘটনাস্থলে অবিলম্বে গেলেন এবং আশেপাশে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রুম্‌নি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এই যে, এই বাক্সটার পেছনে রয়েছে। ওই যা, আবার পালাল!

খরগোশ ঘর ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া সোজা ছুট দিল। অঘোরবাবু, ভিখন তেওয়ারী, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি সকলেই দৌড়িয়া একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ভিখন তেওয়ারী অভিমত প্রকাশ করিল যে, উহাকে খুঁজিয়া পাওয়া এখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত, সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা। মংলু মাঝিকে খবর দিয়া সে মালকাইনদের জন্য আবার খর্‌হা সংগ্রহ করিয়া দিবে। এ জঙ্গলে খরগোশের অভাব নাই। অঘোরবাবুর দিকে ফিরিয়া সে অনুমতি ভিক্ষা করিল যে, হুজুর যদি হুকুম দেন, তাহা হইলে সে এখন ভান্‌সা-ঘরে অর্থাৎ রান্নাঘরে ফিরিয়া যায়, কারণ সে অধন্‌ অর্থাৎ ভাতের জল চড়াইয়া আসিয়াছে। অঘোরবাবু অনুমতি দিলেন। ভিখন তেওয়ারী চলিয়া গেলে রুম্‌নি বলিল, ও যাকগে। আমরা আর একটু খুঁজে দেখি চল।

ঝুম্‌নি তৎক্ষণাৎ তাহা সমর্থন করিয়া বলিল, ও নিশ্চয়ই এইখানে কোথাও আছে, অতটুকু বাচ্চা খরগোশ কি আর বেশিদূর দৌড়তে পারবে? নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে প'ড়ে কাছাকাছি কোন ঝোপেঝাপে লুকিয়ে আছে।

অঘোরবাবু প্রতিবাদ করিলেন না। কহিলেন, যা বলেছ দিদিমণি, আর একটু খুঁজেই দেখা যাক। কুম্ভীর সাজিয়া হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা এ কার্য অধিক মনোরম বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তাঁহারা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে নিবিড়তর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। নিবিড় জঙ্গল মনুষ্য-বিরল হইলেও শব্দ-বিরল নহে। বনের নিজস্ব একটা ধ্বনি আছে। তাহা ছাড়া নানাবিধ পাখির ডাক। ঘুগ্-ঘুগ্-ঘুগ্—অজ্ঞাতনামা এক পাখি অবিশ্রান্ত ডাকিয়া চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া আর একটি অজানা পাখি ভিন্ন গ্রামে ডাকিতেছিল, ক্রেকট্-ক্রেকট্-ক্রেকট্। বনের মধ্য হইতে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় আসিতেই তাহারা দেখিল যে, চকিতে এক পক্ষী-দম্পতি দ্রুতধাবনে নিকটস্থ একটা ঝোপে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অঘোরবাবু বলিলেন, এক জোড়া তিতির।

সহসা ঝুম্নি বলিয়া উঠিল, দেখ দেখ, কেমন সুন্দর ফুল!

রুম্নিও মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, চমৎকার! কিসের ফুল ওগুলো?

অঘোরবাবু বলিলেন, ও একটা পরগাছার ফুল।

প্রকাণ্ড একটা বৃদ্ধ বৃক্ষের উপর একটা দুঃসাহসিনী পরগাছা-লতা উঠিয়া স্তবকে স্তবকে সুন্দর ফুল ফুটাইয়া হাসিতেছে, যেন বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার কাঁধে চাপিয়া অলঙ্কৃতা নাতনী আবদার জুড়িয়া দিয়াছে।

ওখানে একটা সাদা রঙের কি?

বস্তুত একটা সাদা চুনকাম-করা ঘরের দেওয়ালের

খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছিল। রুম্‌নি জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি দাদু ?

ওটা যম-ঘর।—বলিয়াই অঘোরবাবু বলিলেন, ও এমনই একটা ঘর, বনের মধ্যে করা আছে, ও এমন কিছুই নয়। চল এবার ফেরা যাক।

রুম্‌নি বলিল, চল না, ওটা দেখে আসি।

ঝুম্‌নি বলিল, হাঁ, চল।

অঘোরবাবু মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন, চল। ওতে দেখবার কি আছে ? তার চেয়ে চল, গিয়ে এখন কুমীর-কুমীর খেলিগে।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি কিন্তু ছাড়িল না। ঘর তাহাদের দেখাইতেই হইল। সত্যই ঘরটিতে দেখিবার বিশেষ কিছু ছিল না। ঘরের বিশেষত্ব শুধু এই যে, তাহার চারিদিকেই পাকা দেওয়াল দিয়া ঘেরা, খুব উঁচু দেওয়াল এবং ঘরের যে একটি দ্বার আছে তাহাও লৌহের এবং তালা-বন্ধ। জানালা একটিও নাই।

রুম্‌নি বলিল, এটাতে কি হয় ?

কিছু নয়, তোমার দাদুর অমনি শখ হয়েছিল।

অঘোরবাবু এই ঘন জঙ্গলে অবস্থিত ঘরটির ইতিহাস গোপন রাখিলেন। স্বয়ং উগ্রমোহন সিংহ, অঘোরবাবু এবং ভিখন তেওয়ারী ছাড়া যম-ঘরের প্রকৃত পরিচয় কেহ জানিত না। জমিদারির অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ মনে করিত, উহাতে বাবুর শিকারের আসবাবপত্রাদি বন্ধ থাকে।

তাহারা তিনজনে ফিরিতেছিল, এমন সময় ভিখন

তেওয়ারী আসিয়া খবর দিল যে, মৃন্ময় ঠাকুর আসিয়াছেন এবং অঘোরবাবুর মোলাকাৎ ভিক্ষা করিতেছেন।

১০

অঘোরবাবু আসিয়া মৃন্ময় ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিলেন। এতকাল অবশ্য মৃন্ময় ঠাকুরই অঘোর-বাবুকে নমস্কার করিয়া আসিয়াছেন। কারণ অঘোরবাবু জমিদারের মহামান্য ম্যানেজার এবং মৃন্ময় ঠাকুর সামান্য একজন প্রজা মাত্র। চাকা কিন্তু ঘুরিয়া গিয়াছে। উগ্রমোহনবাবুর নাতনীদ্বয়ের সঙ্গে মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের বিবাহ হইবে, সুতরাং মৃন্ময় ঠাকুরকে এখন সামান্য প্রজারূপে গণ্য করা চলিবে না। অঘোরবাবু তাহা বুঝিলেন এবং বুঝিয়াই শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিলেন। ইহার উত্তরে মৃন্ময় ঠাকুর কিন্তু যাহা করিলেন, তাহা এতই অপ্রত্যাশিত যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মৃন্ময় ঠাকুর অঘোরাববুর পাদদেশে দড়াম করিয়া পড়িয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অঘোরবাবু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে ভিতরে যাইতে বলিয়া শশব্যস্তে মৃন্ময় ঠাকুরকে দুই হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, ছি ছি, এ কি করলেন আপনি!

বাঁচান আমাকে ম্যানেজারবাবু, আর তো বেশিদিন বাকি নেই। কোন উপায় আর ভেবে পাচ্ছি না।

কিসের উপায় ?

বাঁচবার। এ বিয়ে আমি দিতে চাই না অঘোরবাবু। আপনি কোন উপায় ক'রে এ থেকে উদ্ধার করুন আমাকে।

অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া মৃন্ময় ঠাকুর আশা বা নিরাশা কিছুরই আভাস পাইলেন না।

অঘোরবাবু কেবল বলিলেন, মালিকের যখন এই অভিপ্রায়, তখন আমি আর কি করতে পারি? এস্টেটের যদি কোন ব্যাপার হ'ত, আমি কিছু হয়তো করতে পারতাম। কিন্তু এসব বিবাহ-ব্যাপারে আমার কোনও কথা চলবে না। আপনার আপত্তিটা কি ?

মৃন্ময় ঠাকুর মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিস্ফারিত ও অবিস্ফারিত উভয় চক্ষেই সংশয়াকুল দৃষ্টি দেখিয়া অঘোরবাবু আবার বলিলেন, অবশ্য যদি আমাকে বলতে বাধা থাকে, শুনতে চাই না আমি; কিন্তু উগ্রমোহনবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করা কোনও দিক থেকেই তো অবাঞ্ছনীয় মনে করি না।

মৃন্ময় ঠাকুর বলিলেন, গঙ্গাগোবিন্দের বংশপরিচয় সব জানেন আপনি? গঙ্গাগোবিন্দ নিজে অবশ্য লোক ভাল, পণ্ডিত সজ্জন লোক; কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের পিতামহ নাকি সমাজে পতিত হয়েছিলেন, তাঁর দুশ্চরিত্রা এক বিধবা মেয়েকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন ব'লে।

অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডল কঠিনতর হইল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, আসল কথাটা কি বলুন? কোথা থেকে

এসব গুজব আপনার কানে এল? গঙ্গাগোবিন্দ উগ্রমোহন-বাবুর ভাগ্নীজামাই, তা জানেন?

মৃন্ময় ঠাকুরের বিস্ফারিত চক্ষুটি অসহায়ভাবে অঘোরবাবুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

অঘোরবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা থেকে এসব বাজে কথা শুনলেন আপনি?

একটা ঢোক গিলিয়া মৃন্ময় ঠাকুর বলিলেন, কথাটা বলবেন না যেন উগ্রমোহনবাবুকে। পৃথ্বীশপুরের কালীপদ পুরোহিত আমাকে বলছিলেন। তিনি এদিককার একটা প্রাচীন লোক। তাঁর কথা সহজে অবিশ্বাস করা—

মৃন্ময় ঠাকুর কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

অঘোরবাবু মৃন্ময় ঠাকুরকে বলিলেন, আপনি বসুন ওখানে। ভিখন তেওয়ারী!

ভিখন তেওয়ারী আসিতেই তিনি হুকুম দিলেন, চারিজন সিপাহী এখনই পৃথ্বীশপুরে পাঠাইয়া কালীপদ পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত কর।

ব্যাপারটা যে এতদূর চট করিয়া গড়াইয়া যাইবে, মৃন্ময় ঠাকুর তাহা ভাবেন নাই। তিনি তাড়াতাড়ি অঘোরবাবুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আহা, পুরোহিত মশাইকে আবার কেন কষ্ট দেবেন এত বেলায়? আমার কথাটা শুনুন শেষ পর্যন্ত।

নিষ্পলক এক জোড়া চক্ষু মৃন্ময়ের মুখের উপর স্থাপিত

করিয়া ধীরকণ্ঠে অঘোরবাবু বলিলেন, আপনি বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করছেন। বুঝে-সুঝে করবেন।

মৃন্ময় ঠাকুর এইবার তাঁহার শেষ চালটি চালিলেন, অর্থাৎ পকেট হইতে একখানি এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া অঘোরবাবুর হাতে দিতে গেলেন।

বিস্মিত অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে কি?

মিনতি করিয়া মৃন্ময় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, অতি দরিদ্র আমি। এর বেশি আর আমার সামর্থ্য নেই। দয়া ক'রে ভেঙে দিন বিয়েটা। আপনি ইচ্ছে করলে সবই পারেন। উগ্রমোহনবাবু আপনার পরামর্শ কখনও অগ্রাহ্য করেন না।

কথাটা ঠিক। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, অঘোর চক্রবর্তী উগ্রমোহন সিংহের সুযোগ্য ম্যানেজার। উগ্রমোহনের আত্ম-সম্মানলাঘবকারী কোন পরামর্শ আজ পর্যন্ত তিনি তাঁহাকে দেন নাই। মৃন্ময় ঠাকুরের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আপনি আমাকে যে অপমান করলেন, এখনই তার উপযুক্ত জবাবদিহি আপনাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে করতে হ'ত। কিন্তু আপনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির শ্বশুর হবেন, আপনার শারীরিক অপমান আমি করব না। আপনি স্থির হয়ে বলুন দেখি, কি আপত্তি আপনার? সত্যই কি গঙ্গাগোবিন্দের পিতামহ সম্বন্ধে ও-কথা শুনেছিলেন আপনি?

মৃন্ময় ঠাকুর বলিলেন, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বইকি। কালীপদ পুরোহিতের কাছেই শুনেছিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, আমার আসল আপত্তি তা নয়। আসল আপত্তিটা হচ্ছে

গিয়ে যে, আমার ছেলেদের আমি অন্যত্র সম্বন্ধ করেছি, তারা হাজার পাঁচেক টাকা দেবে, গয়নাপত্তর দেবে, তাছাড়া দুশো বিঘে জমি লিখে দেবে বলেছে।

অঘোরবাবু শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, তাঁহার পাথরের মত মুখ পাথরের মত হইয়া রহিল, কোনরূপ ভাবান্তর ঘটিল না। তিনি দক্ষিণ করতল দিয়া কেবল তাঁহার তামাটে গোঁফ জোড়া অকারণে গুছাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে এরূপভাবে নীরব থাকিতে দেখিয়া মৃন্ময় ঠাকুর মনে করিলেন, অঘোরবাবু বুঝি বা তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন। বিস্ফারিত চক্ষুটিতে আরও একটু মিনতির ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনি বুদ্ধিমান লোক। আমাদের গরিবের সুখ-দুঃখ বুঝবেন আপনি। উগ্রমোহনবাবুর কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারব না তো আমি। তিনি যা দেবেন আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। অথচ কমলাক্ষবাবু—

কমলাক্ষ? কোন্ কমলাক্ষ? চন্দ্রকান্তবাবুর ম্যানেজার?

তিনটি প্রশ্ন যেন তিনটি গুলির মত অঘোরবাবুর মুখ হইতে বাহির হইল। অন্যমনস্কতার জন্য অসাবধানে কমলাক্ষবাবুর নামটা মৃন্ময় ঠাকুরের মুখ দিয়া ফসকাইয়া বাহির হইয়া পড়াতে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং সামলাইবার জন্য বলিলেন, না না, এ অন্য কমলাক্ষ। অর্থাৎ—

অঘোরবাবু ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে তিনি মাত্র বলিলেন, ও। এবং তাহার পর সস্মিতমুখে মৃন্ময় ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, এটা

অবশ্য আপনি ওয়াজিব কথাই বলেছেন। মালিকের সঙ্গে দেখা হ'লে আমি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। আমার বিশ্বাস টাকার জন্মে আটকাবে না। টাকার জন্মে উগ্রমোহনবাবু কখনও পিছপাও হয়েছেন জানেন ?

মৃন্ময় ঠাকুর সভয়ে বলিলেন, না না, অমন কাজও আপনি করবেন না। তাঁর কাছে ম'রে গেলেও আমি পণের কথা বলতে দেব না আপনাকে। উগ্রমোহনবাবু হলেন জমিদার, পিতৃতুল্য, তাঁর সঙ্গে কি আর পণ নিয়ে দর-কষাকষি করা সাজে আমার ? আপনি বরং বাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ব'লে মতটা পালটে ফেলুন। বড়লোকের খেয়াল বই তো নয়, খড়ের আগুন, হু-হু ক'রে জ্ব'লে ওঠে, আবার তখনই নিবে যায়। বুঝলেন ? মানে, আপনি যদি মত দেন, তা হ'লে আমি সেই মেয়ে ঢুটিকে আজই সন্ধ্যের সময় আশীর্বাদ করি। সেই রকমই কথা আছে কিনা, অর্থাৎ—

অঘোরবাবু কেবল বলিলেন, আসুন আমার সঙ্গে।

উভয়ে উঠিয়া গেলেন। কাছারি-বাড়ির পিছন দিকে গিয়া অঘোরবাবু একটি ঘরের তালা উন্মোচন করিতে লাগিলেন।

মৃন্ময় ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ধারে এলেন যে ?

অঘোরবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, গোপনীয় পরামর্শ সব অমন খোলা জায়গায় ব'সে করা ঠিক নয়। ভেতরে আসুন।

মৃন্ময় ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঘরের ভিতরটায় কেমন

যেন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ—অনেকদিন অব্যবহৃত মাটির ঘরে সাধারণতঃ যেমন হয়। অঘোরবাবু বলিলেন, আপনি একটু বসুন। আসছি আমি।—বলিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া চট করিয়া শিকলটা লাগাইয়া দিয়া তালা দিতে দিতে বলিলেন, চুপ ক'রে ব'সে থাকুন। চেঁচাবেন না। মালিক না আসা পর্যন্ত একটু কষ্ট করতে হবে।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নির ভাবী শ্বশুরের বিস্ফারিত চক্ষুটি অন্ধকারে আরও বিস্ফারিত হইয়া গেল।

১১

অঘোরবাবু ফিরিয়া আসিতেই রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, ও কে এসেছিল? সেদিন আমাদের আশীর্বাদ ক'রে গেল ওই না? কে বল না দাদু, ও কে?

অঘোরবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, ও শ্বশুর।

খরগোশ, পারাবত প্রভৃতির মত শ্বশুরও ঠিক সমজাতীয় একটি পোষ্য জীব কি না—ইহাই বোধ হয় তাহারা ভাবিতেছিল, এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং ঘর্মাক্তকলেবর ফেনায়িতমুখ একটি অশ্বোপরি উগ্রমোহন সিংহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। অঘোরবাবু প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সঙ্গে যে সহিস আসিয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া

উগ্রমোহন বলিলেন, খেলনা, বাঁশী—এসব কোথা রেখেছিস, বার কর। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, কই, তোদের চোখ তো ফোলা দেখছি না!

চোখ ফুলবে কেন শুধু শুধু?—বলিয়া তাহারা হাসিয়া ফেলিল। উগ্রমোহনবাবু বিরস-বদনে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি কত আশা ক'রে আসছি যে, গিয়ে দেখব, আমার বিরহে কেঁদে কেঁদে তোদের চোখ ফুলে গেছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে—

ভারি ব'য়ে গেছে আমাদের। নিজে তো বেশ আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে পালিয়ে গেলেন সেদিন রাত্তিরে।

সহিস কয়েকটি সুদৃশ্য পুতুল, দুইটি বাঁশী প্রভৃতি আনিয়া রাখিতেই রুম্‌নি-ঝুম্‌নি তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং সেই সুযোগে অঘোরবাবু উগ্রমোহনের নিকট নিম্নস্বরে কহিলেন, গোপনীয় কিছু নিবেদন করবার আছে আমার।

কি ব্যাপার?—বলিয়া পিছনের বারান্দার দিকে উগ্রমোহন ও অঘোরবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন।

সমস্ত কথা আনুপূর্বিক শুনিয়া উগ্রমোহন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া গেল এবং বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তিনি ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার হুকুমে তুমি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির ভাবী শ্বশুরকে এত বড় অপমান করবার সাহস করলে?

মৃতা কমলার বৈবাহিকের এই দুর্দশায় তাঁহার নিজেরই যেন আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। অঘোরবাবু যেন এইরূপ

একটা প্রশ্নের প্রন্থ প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তিনি:উগ্রমোহনকে চিনিতেন। তাই মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার অপরাধ হয়েছে, তা স্বীকার করছি। কিন্তু ওঁকে অপমান আমি করি নি। ওঁকে আটকে রাখতে বাধ্য হয়েছি এইজন্যে যে, তা না হ'লে আজই সন্ধ্যায় উনি কমলাক্ষের নির্বাচিত দুটি পাত্রীকে আশীর্বাদ ক'রে আসতেন। হুজুরই আমাকে হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন যে, মৃন্ময় ঠাকুর যদি আসেন, তা হ'লে তাঁর ব্যবহার অনুযায়ী যথোচিত ব্যবহার যেন আমি করি। আপনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে দিয়েছিলেন ব'লেই—

উগ্রমোহনের যদিও সত্যই কিছু বলিবার ছিল না, তথাপি তিনি তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, হ্যাঁ, যথোচিত ব্যবহারই করেছ দেখছি। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের স্পর্ধায় এবং তাহাতে চন্দ্রকান্তের গন্ধ পাইয়া উগ্রমোহন যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। বিস্ফারিতচক্ষু ওই ব্রাহ্মণটাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিলে যেন তিনি শান্ত হন।

অঘোরবাবুকে বলিলেন, এতই করেছ যখন, তখন বাকিটুকুও সেরে ফেল। ওই শালগাছের গুঁড়িতে ওকে বেঁধে আগাপাছতলা চাবকে দূর করে দাও। ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে দূর করে দাও। ও-রকম অন্ত্যজের ছেলেদের সঙ্গে আমি ঝুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিয়ে দেব না।

অঘোরবাবু একবার নিষ্পলকনেত্রে প্রভুর দিকে তাকাইলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, আপনি কিন্তু ছেলে দুটিকে আশীর্বাদ করে পাকা কথা দিয়ে এসেছেন।

এমন সময় রুম্‌নি-ঝুম্‌নি কলরব করিতে করিতে আসিয়া কহিল, ও দাহু, দেখবে এস, কে এসেছে!

উগ্রমোহন গিয়া দেখিলেন, স্মিতমুখে গঙ্গাগোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন।

গঙ্গাগোবিন্দের এই আগমন আকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। তাহার কারণ, স্বয়ং উগ্রমোহনই গঙ্গাগোবিন্দকে খবর পাঠাইয়াছিলেন যে রুম্‌নি-ঝুম্‌নির জন্য চিন্তা নাই, তাহারা যম-জঙ্গলে অঘোরবাবুর কাছে সুখেই আছে। বিবাহের প্রসঙ্গটা অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। শুভকর্ম একেবারে সম্পন্ন করিয়া তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে খবর দিবেন, ইহাই স্থির ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ উগ্রমোহনের পদধূলি লইয়া হাসিমুখে কহিল, এরা এখানে বেশ আমোদেই আছে দেখছি। কিন্তু আমার আর একা থাকতে ভাল লাগছে না; এদের আজ নিয়ে যাব ভাবছি।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি প্রাঙ্গণস্থ পারাবতগুলিকে খাদ্য বিতরণ করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে উগ্রমোহন বলিলেন, হ্যাঁ, নিয়ে যাবে বইকি। তবে আজ নয়, একেবারে চব্বিশে মাঘ নিয়ে যেও।

গঙ্গাগোবিন্দ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তাহার পর গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, একটা কথা শুনলাম—খুব সম্ভবত গুজব ওটা, কিন্তু শুনলাম যখন, তখন আপনাকে বলাই ভাল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা ?

একটু ইতস্তত করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ শেষে বলিয়াই ফেলিলেন, শুনলাম নাকি আপনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ ঠিক ক'রে ফেলেছেন নিমাইনগরে মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গে ? এটা এতই অসম্ভব ব্যাপার—

তাঁহার কথা শেষ না করিতে দিয়া উগ্রমোহন বলিলেন, অসম্ভব মোটেই নয়। যা শুনেছ, তা ঠিক। আগামী তেইশে মাঘ বিবাহ হবে। আশীর্বাদ করা হয়ে গেছে।

গঙ্গাগোবিন্দ কথাগুলি শুনিয়া কি যে বলিবেন, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া অসংলগ্নভাবে বলিলেন, আমি কিছু—তার মানে—

উগ্রমোহন শুধু বলিলেন, আমি যা ভাল বুঝেছি, তা করেছি। এখন তুমি যা বোঝ, করতে পার।

গঙ্গাগোবিন্দ কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমার এ বিবাহে অমত আছে।

বেশ। তোমার অমতেই বিবাহ হবে, তার কারণ এতে আমার মত আছে। মৃন্ময় ঠাকুরের অবস্থা ভাল, তার ছেলে দুটিও ভাল, আমার বিচারবুদ্ধি অনুসারে এ বিবাহ মঙ্গলেরই হবে।

গঙ্গাগোবিন্দ তবু কিছু বলেন না দেখিয়া উগ্রমোহন আবার বলিলেন, মঙ্গলেরই হোক আর অমঙ্গলেরই হোক, যখন কথা দিয়েছি, তখন এ বিবাহ হবেই।

গঙ্গাগোবিন্দ এইবার কথা বলিলেন, আপনি বেশি

বলশালী, আমি দুর্বল। সুতরাং শক্তি সংগ্রহ না ক'রে আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কারণ আপনার একমাত্র যুক্তি দেখছি শক্তি। তা হ'লে এইবার আমি উঠি। যদি পারি, আপনার কথার জবাব আর একদিন দেওয়া যাবে।

উগ্রমোহন বলিলেন, তোমাকে যদি এখন যেতে না দেওয়া হয়?

গঙ্গাগোবিন্দের মুখে একটু হাসি ফুটিল। ধীরভাবে তিনি বলিলেন, এই ধরনের একটা কিছু আপনার নিকট প্রত্যাশা করছিলাম। আপনি আমাকে বলপ্রয়োগ ক'রে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আমিও যতক্ষণ প্রাণ থাকবে চ'লে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি দুর্বল, অবশ্য ম'রে যেতে পারি; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করব এখানে না থাকার।

বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইতে উগ্রমোহন অঘোর-বাবুকে বলিলেন, আমার হুকুম, একে যেন কোনক্রমে এখান থেকে যেতে না দেওয়া হয়।

বজ্রাহতের ন্যায় গঙ্গাগোবিন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল এবং তিনি দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটাকে কামড়াইয়া ধরিলেন।

ঠিক এমনই সময় রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ও দাদু, ও বাবা, দেখবে এস, দুটো পায়রা কেমন মারামারি করছে! কালো পায়রাটা কি ভয়ঙ্কর রাগী!

তাই নাকি?—বলিয়া উগ্রমোহন নাতনীদ্বয়ের সহিত

বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া তিনি ডাকিলেন, অঘোর, শুনে যাও। অঘোরবাবুও বাহিরে গেলেন।

নিম্নস্বরে অঘোরবাবু একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, মনে করুন, উনি যদি জোর ক'রে চ'লে যেতে চান, তা হ'লে—

উগ্রমোহন উত্তর দিলেন, জোর ক'রে তুমি ধ'রে রাখবে। এখানে পঞ্চাশজন সিপাহী আছে।

অঘোরবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

উগ্রমোহন আরও বলিলেন, ওকে দিয়েই আমি সম্প্রদান করাব।

ঝুম্‌নি আসিয়া বলিল, দাদু, আমাদের খরগোশটা পালিয়ে গেছে, জান?

উগ্রমোহন হাসিয়া বলিলেন, বাঁচা গেছে।

ঝুম্‌নি বলিল, মংলুকে ব'লে আর একটা আনিয়ে দাও।

উগ্রমোহন বলিলেন, মংলু কে?

অঘোরবাবু উত্তর দিলেন, মংলু একজন সাঁওতাল মাঝি। তাকে আর দরকার হবে না, আমাদের সহিসকে ব'লে দিলেই হবে। এই এখনই ব'লে দিচ্ছি। ওরে পচ্‌না!

পচ্‌না সহিস আসিয়া সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইতেই অঘোরবাবু বলিলেন, একটা খর্‌হার বাচ্চা চাই। ঘোড়াকে দানাপানি দিয়েছিস?

পচ্‌না সসম্ভ্রমে উত্তর দিল যে, জামাইবাবু ঘোড়া লইয়া এইমাত্র একটু হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ মেধাবী লোক এবং চন্দ্রকান্তের বন্ধু।

উগ্রমোহনের অশ্ব লইয়াই সে বনত্যাগ করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়া গিয়াছে, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। অঘোরবাবু ও উগ্রমোহন পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন, এইবার তুমি পেন্‌শন নাও। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি ক্রমশই ক'মে যাচ্ছে।

অঘোরবাবু কিছুই বলিলেন না। তাঁহার প্রস্তরবৎ মুখ প্রস্তরবৎ রহিল। মনে মনে কিন্তু তিনি গঙ্গাগোবিন্দের এই পলায়নে খুশীই হইলেন। তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

পিতার আকস্মিক অন্তর্ধানে রুম্‌নি-ঝুম্‌নি অবাক হইয়া গেল। অঘোরবাবু তাহাদের বুঝাইলেন যে, একটা জরুরি দরকারে তিনি গিয়াছেন, কাল হয়তো আসিবেন।

ক্রমশ সন্ধ্যা হইল। রুম্‌নি-ঝুমনি ঘুমাইল।

উগ্রমোহন তখন বলিলেন, মৃন্ময়কে ডাক, চল, ওই উত্তর দিকের ঘরটায় যাওয়া যাক।

মৃন্ময় ঠাকুর যখন আসিলেন, তখন তিনি ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। তাঁহার দুই চক্ষুতে দরবিগলিত অশ্রুধারা। উগ্রমোহন তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি যা করেছ, তোমাকে কেটে পুঁতে ফেলা উচিত। তা আমি করব না। যা বলছি, তাই কর।—বলিয়া তিনি অঘোরবাবুকে দোয়াত কলম এবং কাগজ আনিতে বলিলেন। দোয়াত কলম এবং কাগজ আসিলে তিনি বলিলেন, মায়াকান্না ছেড়ে এখন যা বলি, তাই লেখ। জোচ্চোর বদমায়েশ কোথাকার! কলম নাও, লেখ।

মৃন্ময় ঠাকুর লেখনী ধারণ করিয়া উগ্রমোহনের নির্দেশ অনুযায়ী লিখিলেন—

কল্যাণবরেষু,

বাবা, অজয়, বিজয়, তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবা। অত্র যম-জঙ্গল কাছারিতে আসিয়া আমি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়া বিধায় বাটী ফিরিতে পারি নাই। এখনও চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় আছি। তোমরা অতি শীঘ্র এই পত্রবাহকের সহিত চলিয়া আসিবা। তোমার মাতাঠাকুরাণীর আসিবার দরকার নাই। তোমরা আসিলে আমি তোমাদের সঙ্গে ফিরিয়া যাইব। আসিতে কদাচ অন্যমত করিবা না। আশীর্বাদ জানিবা। ইতি

আশীর্বাদক মৃন্ময় ঠাকুর

পত্র লইয়া আটজন সিপাহী নিমাইনগর যাত্রা করিল।

১২

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। সমস্ত বন পূর্ণ করিয়া ঝিল্লিধ্বনি। দুই-একটা নিশাচর পাখির ডাক তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে অন্ধকারকে যেন চিরিয়া ফেলিতেছে। ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রটি শিরীষ-গাছের মাথার উপর দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অগ্নিকুণ্ড। তাহার চতুর্দিকে কয়েকজন সিপাহী বসিয়া অগ্নি-সেবা করিতেছে। অঘোরবাবু নিজ ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছেন। ঝুম্‌নি-ঝুম্‌নি নিদ্রামগ্ন। মৃন্ময় ঠাকুরের দুর্দশা ঘুচাইয়া উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে উত্তর দিকের

ঘরটায় শুইতে দিয়াছেন। ভদ্রভাবে বিছানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, দ্বারে কিন্তু সশস্ত্র প্রহরী। মৃন্ময় ঠাকুর ঘুমাইতেছেন কি না ভগবান জানেন, তাঁহার কিন্তু উভয় চক্ষুই মুদ্রিত।

মাঝের ঘরটায় উগ্রমোহন সিংহ রহিয়াছেন। তাঁহার নগ্নকায়, পরিধানে শুধু কৌপীন। ভিখন তেওয়ারীর সহিত তিনি কুস্তি লড়িতেছিলেন। এই শীতের সন্ধ্যাতেও তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। উগ্রমোহনের ইহা একটি বিলাস। তাঁহার সিপাহীদের মধ্যে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশজন কুস্তিগীর পালোয়ান আছে, এবং তাহারা প্রভুর সহিত কুস্তি লড়িতে পাইলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। অদ্য সন্ধ্যায় তিনি ভিখন তেওয়ারীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। দুইজনে বীরবিক্রমে মল্লযুদ্ধে উন্মত্তপ্রায়। বাহিরে বনানীশীর্ষে শুক্লা-চতুর্থীর চাঁদ অস্তাচলগামী। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর উগ্রমোহন ভিখন তেওয়ারীকে চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চিত মানেই জিত। ভিখন তেওয়ারী উঠিয়া প্রভুর পদধূলি লইল, উগ্রমোহন তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, সাবাস!

বাহিরে কে মৃদুস্বরে ডাকিল, হুজুর!

উগ্রমোহন গায়ে একটা কম্বল চাপা দিয়া ভিখন তেওয়ারীকে দ্বার খুলিতে আদেশ দিলেন। দ্বার খুলিলে উগ্রমোহন সিংহ দেখিলেন যে, নিমাইনগরে যে আটজন সিপাহী গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়াছে। তাহাদের বার্তা এই, আজ সকাল হইতে মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়কে পাওয়া যাইতেছে না।

সেতারের কানে মোচড় দিতে দিতে হাসিমুখে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর? ছেলে দুটো গিয়ে পালকিতে উঠল?

কমলাক্ষবাবু উত্তর দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেতারের জুড়ি তার দুইটিতে মেজ্‌রাপের মৃদু আঘাত দিতে দিতে চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন, আমাদের বিশ্বাস-মশাইয়ের ছেলে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে তা হ'লে বল?

কমলাক্ষবাবু কোন উত্তর দিলেন না। কমলাক্ষবাবু লোকটির কমলাক্ষ নাম এই হিসাবে সার্থক যে, তাঁহার চোখ দুইটি রক্তাভ এবং বেশ ভাসা-ভাসা। আঁটসাঁট গড়নের নাতিদীর্ঘ লোকটি। অত্যন্ত স্বল্পভাষী। মামলা-মকদ্দমা করার দিকে একটু ঝোঁক বেশি। তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়—এই ভাবটি কমলাক্ষবাবুর চোখে মুখে এবং সর্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কমলাক্ষ-বাবু কিন্তু চন্দ্রকান্তকে অর্থাৎ চন্দ্রকান্তের বুদ্ধিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। সেজন্য চন্দ্রকান্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি চন্দ্রকান্তের সকল আদেশ পালন করিতেন, তাঁহার সর্বদা ভয় হইত যে, চন্দ্রকান্ত যেরূপ বুদ্ধিমান তাহাতে তাঁহার কোন কার্যই হয়তো চন্দ্রকান্তের মনোমত হইতেছে না। ইহা লইয়া চন্দ্রকান্ত অবশ্য কখনও কিছু বলেন নাই। কিন্তু এই ধারণা বদ্ধমূল থাকাতে কমলাক্ষ যখনই কোন কার্য-উপলক্ষ্যে চন্দ্রকান্তের সমীপবর্তী হইতেন, তখনই

তাঁহার আচারব্যবহারে কথাবার্তায় কেমন যেন একটা ভিজা-বিড়াল-গোছ ভাব ফুটিয়া উঠিত।

ম্যানেজারকে নীরব থাকিতে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, অর্থাৎ সংক্ষেপে এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের গোমস্তা বিশ্বাস মশায়ের ছেলে—ছেলে দুটোকে রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে দেখাবার নাম ক'রে গঙ্গাগোবিন্দের বাড়িতে নিয়ে আসে এবং সেখানে তুমি তাদের বল যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি এখানে নেই—যম-জঙ্গলে আছে। তুমি পালকির বন্দোবস্ত ক'রে দেবার প্রস্তাব কর এবং তারা সে প্রস্তাবে রাজী হওয়াতে তুমি তাদের পালকিতে ক'রে তুলে নিয়ে টাল-জঙ্গলের কাছারিতে চালান ক'রে দিয়েছ। এই তো?

কমলাক্ষ নীরবে মাথা নাড়িলেন। সেতারের ঘরগুলিতে একবার হাত চালাইয়া চন্দ্রকান্তের সন্দেহ হইল, উদারার নি পর্দাটা ঠিক মনোমত আওয়াজ দিতেছে না। তিনি ঘাটটা একটু সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, আমাদের বিশ্বাস-গোমস্তার ছেলের সঙ্গে যে অজয়-বিজয়ের আলাপ আছে, তুমি জানলে কি ক'রে?

ওরা শ্যামগঞ্জ স্কুলে একসঙ্গে পড়ে কিনা।

ও।

চন্দ্রকান্ত কাফির একটা গৎ আস্তে আস্তে বাজাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি অন্য কিছু চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ তিনি আদেশ করিলেন, বিশ্বাসকে ডাক।

রাধামাধব বিশ্বাস এই এস্টেটের প্রাচীন কর্মচারী। মলিন ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা বাহিরে ছাড়িয়া আসিয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই চন্দ্রকান্ত বলিয়া উঠিলেন, আপনার ছেলে এক কাণ্ড ক'রে ব'সে আছে। মৃন্ময় ঠাকুরের দুই ছেলে অজয়-বিজয়ের সঙ্গে আমাদের রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিয়ের সম্বন্ধ বুঝি হচ্ছিল। রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লুকিয়ে দেখাবে ব'লে আপনার ছেলে আজ তাদের গঙ্গাগোবিন্দের বাড়িতে এনেছিল। যত সব ছেলেমানুষী বুদ্ধি! তার ওপর কমলাক্ষ করেছে আর এক কাণ্ড। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আছে উগ্রমোহনের বনকর কাছারিতে, কমলাক্ষ ব্যাপারটা ঠিক জানত না, এক পালকি ক'রে দিয়েছে পাঠিয়ে তাদের টালে। দেখুন দিকি কাণ্ড!

কমলাক্ষ এবং বিশ্বাস উভয়েই বিস্মিত হইল।

চন্দ্রকান্ত আবার কাফির গতে মন দিলেন। একটু বাজাইয়া আবার বলিলেন, আপনি এক কাজ করুন বিশ্বাস মশায়। আপনি এখনই কিছু খাবার-টাবার নিয়ে আর আপনার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে টালে রওনা হয়ে যান। ছেলে দুটোর তা না হ'লে সেখানে কষ্টের অবধি থাকবে না। আর কমলাক্ষ ততক্ষণ তাদের বাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দিক। গঙ্গাগোবিন্দও আবার বাড়িতে নেই।

বিশ্বাস মহাশয় মনে মনে ছেলের মুণ্ডপাত করিতে করিতে প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাহির হইয়া গেলেন। এই সময় টালে যাওয়া কি সোজা কথা!

বিশ্বাস চলিয়া যাইতে কমলাক্ষের ভিজা-বিড়াল-ভাবটা

আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রভুর কথাবার্তা সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। কাফির গৎটা মৃদু মৃদু বাজাইতে বাজাইতে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, বিশ্বাসের ছেলেটাকেও টালে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হ'লে সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবে যে। বুঝলে না চালটা? তুমি এক কাজ কর। মোহানিয়া ঘাট পেরিয়ে তবে তো টালে যেতে হয়? বিশ্বাস মশায় নদী পার হয়ে গেলে তুমি কোন অজুহাতে ঘাটের মাঝি-মাল্লা সবাইকে সদরে তলব ক'রে ডাকিয়ে আনাও, অর্থাৎ আজ রাত্তিরে যেন কেউ মোহানিয়া ঘাট পেরিয়ে ওপারে যেতে না পারে, ওপার থেকে আসতেও না পারে। বুঝলে?

এইবার কমলাক্ষ বুঝিয়াছিলেন। প্রভুর এবং প্রভুর বুদ্ধির পদে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

যেন কিছুই হয় নাই। চন্দ্রকান্ত চক্ষু বুজিয়া কাফি গৎ বাজাইতে লাগিলেন। তন্ময় হইয়া বাজাইতেছেন, বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। খানিকক্ষণ পরে মৃদু পদশব্দে চন্দ্রকান্ত চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

ভজনা খানসামা আগাইয়া আসিয়া কহিল, ম্যানেজারবাবু বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, এক মিনিটের জন্য দেখা করিবেন কি?

কমলাক্ষ আসিলে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি?

মোহানিয়া ঘাটে লোক পাঠালাম। আমি ভাবছি, রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে কিড্‌ন্যাপ করার জন্যে এক নম্বর নালিশ ঠুকে দিলে কেমন হয়, গঙ্গাগোবিন্দকে ফরিয়াদী খাড়া ক'রে?

চন্দ্রকান্ত একটু মৃদু হাসিলেন। বলিলেন, তখন তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছলাম। আমার নামে খরচ লিখে তহবিল থেকে শতখানেক টাকা তুমি নিয়ে নাও গিয়ে, বকশিশ দিলাম তোমাকে। তোমার আজকের কাজে আমি খুব খুশী হয়েছি। কিড্‌ন্যাপের মকদ্দমা এখন থাক, পরে ভেবে দেখা যাবে।

কমলাক্ষবাবু ভিজা বিড়ালের মত চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিলেন, বকশিশ আবার কেন, আপনারই তো খাচ্ছি পরছি। তহবিলে এখন মজুত বেশি নেই, তা ছাড়া কাল শ্রীপঞ্চমী—

সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া চন্দ্রকান্ত আবার সেতারে মন দিলেন। কমলাক্ষবাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেই সেতার রাখিয়া চন্দ্রকান্ত একটু মুচকি হাসিলেন এবং গা ভাঙিয়া হাঁকিলেন, ওরে ভজনা, তামাক দিয়ে যা, আর মিশিরজীকে একটু খবর দে।

কাফি রাগিণীর গৎ ও গীত সমস্ত আলাপ করিয়া মিশিরজী যখন বিদায় হইলেন, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। রাধাকিষণজীউর মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বাজিতে শুরু করিয়াছে। নহবৎখানায় বাঁশীতে পূরবী বাজিতেছে। চন্দ্রকান্তের সমস্ত হৃদয় সহসা কেমন যেন বিষাদময় হইয়া উঠিল। আলবোলার নলটা মুখে দিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়া একা বসিয়া রহিলেন। অকারণে কেন যেন তাঁহার মনে হইল, পৃথিবীতে কিছুরই কোন অর্থ নাই।

অকস্মাৎ বাহিরে মাদলের শব্দ শুনিয়া তাঁহার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল, তিনি জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, একদল বেদে-বেদেনী আসিয়া কাছারি-বাড়িতে নাচ গান জুড়িয়া দিয়াছে। একটি উদগ্র-যৌবনা নারী আধ-ময়লা একটা লাল রঙের ঘাগরা এবং নীল রঙের কাঁচুলি পরিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিয়া সকলকে লোলুপ করিয়া তুলিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিলে তিনি ম্যানেজারবাবুকে একবার ডাকিয়া দিতে বলিলেন। ভজনা চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বেদেনীর নাচ দেখিতে লাগিলেন। মাথায় বাবরি-চুলওয়ালা তাহার দুইজন সঙ্গী মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বিভোর হইয়া মাদল বাজাইতেছে। বেশ নাচে তো মেয়েটি! চমৎকার স্বাস্থ্য!

কমলাক্ষবাবু আসিতেই তিনি বলিলেন, ওই বেদে-বেদেনীর দলকে এখনই গ্রাম থেকে দূর ক'রে দাও।

যে আজ্ঞে।

কমলাক্ষ চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত নিজের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি কমলাক্ষকে ডাকাইয়াছিলেন জানিবার জন্য যে, সমস্ত রাত নাচিলে মেয়েটি কত লইবে। অথচ তিনি এ কি বলিয়া বসিলেন!

ম্যানেজারের আদেশক্রমে বেদে-বেদেনীর দল চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত দাঁড়াইয়া দেখিলেন। তাহারা যতক্ষণ দৃষ্টি-পথবহির্ভূত না হইয়া গেল, চন্দ্রকান্ত নিমেষবিহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক কথাই তাঁহার মনে হইল। কি বিচিত্র সৃষ্টি এই নারী! তাঁহার জীবনেও নারী বার কয়েক আসিয়াছিল। অতি বাল্যকালে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন উগ্রমোহনের ভাগিনেয়ীকে। কিন্তু কোষ্ঠী অন্তরায় হইল। গঙ্গাগোবিন্দের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ক্রমশ তাঁহার যৌবন বিকশিত হইল বটে, কিন্তু চন্দ্রকান্ত লেখাপড়া গান-বাজনা ছবি-আঁকা প্রভৃতি লইয়া এত ব্যস্ত রহিলেন যে, অন্য কিছু ভাবিবারই অবসর পাইলেন না। মূর্খ উগ্রমোহনের ধারণা যে, রেশমকে তিনি লুকাইয়া ভালবাসিয়াছিলেন। যে রমণীর প্রেম রজতমূল্যে ক্রয় করা যায়, তাহাকে চন্দ্রকান্ত ভালবাসিতে পারেন না। যে পত্রখানা তিনি রেশমকে লিখিয়াছিলেন এবং যাহা উগ্রমোহন বাহাদুরি করিয়া সেদিন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাহা যে একটা ছদ্ম-প্রেমপত্র, তাহা বুঝিবার শক্তি উগ্রমোহনের থাকিলে আর ভাবনা কি ছিল! উগ্রমোহনের প্রণয়লীলায় বিঘ্ন জন্মাইবার জন্যই তিনি ইচ্ছা করিয়া চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন এবং কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। রেশম বাইজী দুই দিন পরই দেশত্যাগ করিয়াছিল।

চন্দ্রকান্তের অধরে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর অবশ্য জমাটী রকম প্রেমে তিনি পড়িয়াছিলেন, তাহা কলিকাতায়। তাঁহার এক বন্ধুর ভগ্নীর সহিত। সুজাতা তাহার নাম। সুজাতার পিছনে অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন তিনি। কিন্তু বিলাতী জাহাজ যেই এক ব্যারিস্টার আনিয়া

ভারতের তীরে নামাইয়া দিল, অমনই সুজাতার সমস্ত প্রেম উবিয়া গেল। পাড়াগেঁয়ে জমিদারের ছেলে আর বিলাতী-আমদানী ফ্যাশন-দুরস্ত ঝকঝকে ব্যারিস্টার। আকাশ-পাতাল তফাত! সুজাতার নির্বাচনকে দোষ দেওয়া যায় না। মোটের উপর, চন্দ্রকান্ত ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, নারীজাতির সঙ্গে তাঁহার পোষাইবে না। নারীজাতির প্রতি চন্দ্রকান্তের আকর্ষণ যে নাই তাহা নহে, কিন্তু বিতৃষ্ণাও প্রবল। এত ক্ষুদ্র! টাকা দিয়া কেনা যায়। সত্যই টাকা দিয়া কেনা যায়! কই, এমন স্ত্রীলোক একজনও তো তাঁহার চোখে পড়িল না, যে ঐশ্বর্যের মোহে না মুগ্ধ হয়! দরিদ্র স্বামীর যাহারা সতী স্ত্রী, তাহারাও অপরের ঐশ্বর্য দেখিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, আর স্বামীদের বাক্য-যন্ত্রণা দেয়। নাঃ, অতি নীচ এই স্ত্রীজাতিটা। হায় ভগবান, প্রেমাস্পদা মানসীকে এত হীন অকিঞ্চিৎকর করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন? নাঃ, সেতারের সঙ্গে প্রেম করাই ভাল।

ওই বেদেনী মেয়েরাও কি এত নীচ? ভৃত্য ঘরে আলো লইয়া প্রবেশ করাতে চন্দ্রকান্তের চমক ভাঙিল। তিনি বলিলেন, ওরে, জুতো আর ছড়িটা আন্ তো, একটু বেড়াতে বেরুই।

নদীর তীরে তীরে চন্দ্রকান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার নজরে পড়িল যে, নৌকা করিয়া সেই বেদের দল নদী পার হইতেছে। ওপারে তাহাদের তাঁবু রহিয়াছে, তাহাও দেখা গেল।

বেড়াইয়া চন্দ্রকান্ত যখন ফিরিলেন, তখন নহবৎখানায় সানাই ইমন ধরিয়াছে।

১৩

মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়ের আকস্মিক অন্তর্ধান-বার্তা শুনিয়া উগ্রমোহন সহসা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মনের মধ্যে তাঁহার রাগ যতই হউক, সিপাহীদের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইল। পরাজিত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করাটা আত্মসম্মান-হানিকর। উগ্রমোহন ভিতরে ভিতরে পুড়িতে লাগিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্রের স্ফীতি দেখিয়া অঘোরবাবু তাহা বেশ বুঝিতেছিলেন, অঘোরবাবুর পাষাণ-মুখচ্ছবির একটি পেশীও বিকম্পিত হইল না। তিনি মৃদুস্বরে উগ্রমোহনকে বলিলেন, মৃন্ময়কে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, সে কিছু জানে কি না!

উগ্রমোহন বলিলেন, আমি আগে চ'লে যেতে চাই। তুমি মৃন্ময়কে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রো এবং ব'লো যে, যদি তার ছেলেদের সঙ্গে কোন কারণে রুম্নি-ঝুম্নির বিবাহ না হয়, তা হ'লে সামান্য কুকুরের মত ঠেঙিয়ে তাকে মেরে ফেলব আমি।

তাঁহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন। বাহিরে গলার মৃদু শব্দ করিয়া পচ্‌না সহিস ডাকিল, হুজুর।

কে?—অঘোরবাবু গিয়া দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাস তুই?

পচ্‌না উত্তর দিল, ঘোড়াটা হুজুর ফিরে চ'লে এসেছে। জামাইবাবু আসেন নি। কোথাও প'ড়ে-ট'ড়ে যান নি তো? বলেন তো খোঁজ করি।

বস্তুত উগ্রমোহনের ঘোড়ায় চড়িয়া গঙ্গাগোবিন্দ অধিক দূর যান নাই। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। ঘোড়াটা ফিরিয়াছে শুনিয়া উগ্রমোহনের আনন্দ হইল। তিনি এখনই বাড়ি ফিরিতে চান। এতটা পথ অশ্বারোহণে গিয়া বাড়ি পৌঁছিতে তাঁহার অবশ্য রাত্রি হইয়া যাইবে। তা হউক, তাঁহার বাড়ি ফেরা একান্ত দরকার। এস্রাজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার পর হইতে বহ্নির সহিত তাঁহার ভাল করিয়া কথাই হয় নাই। বাহিরে বাহিরে তিনি ফিরিতেছিলেন। সন্ধিকামনায় তাঁহার সমস্ত অন্তর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, মানিক মণ্ডলকে দিয়া ছেলে দুইটার খোঁজখবর করিতে হইবে, বিবাহের আর দিন নাই। তৃতীয়ত, গঙ্গাগোবিন্দ গিয়া পুলিসের শরণাপন্ন হইতে পারে। তাহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাড়ি তাঁহাকে ফিরিতেই হইবে। পুলিসের কথা মনে হইতেই তিনি অঘোরবাবুকে বলিলেন, আমি এখন চ'লে যাচ্ছি। যদি পুলিস আসে আজ রাত্রেই, মারপিট ক'রে হাঁকিয়ে দেবে। পঞ্চাশজন সিপাহী তো আছে। আর রাত্রে যদি কোন গোলমাল না হয়, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আর মৃণ্ময় ঠাকুরকে কাল ভোরেই এখান থেকে সরিয়ে বাথানে নিয়ে রেখে এসো। ওদের রেখে তুমি ফিরে এসো কিন্তু। কাল তোমার এখানে

থাকা চাই। সিপাহীদের সব বাথানে পাঠিয়ে দিও। এক ভিখন তেওয়ারী ছাড়া কারও থাকার দরকার নেই।

অন্ধকারে বন-পথটা সাবধানে পার হইয়া উগ্রমোহন মাঠে পড়িলেন এবং অশ্বের বেগ বাড়াইয়া দিলেন। অন্ধকার ভেদ করিয়া উগ্রমোহনের ঘোড়া ছুটিতে লাগিল।

শীতের নির্মেঘ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র। ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ তীব্র বাতাস বহিতেছে। দৃঢ় বজ্রমুষ্টিতে উগ্রমোহন অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বসিয়া আছেন।

তাঁহার মনের মধ্যে দুইটি মুখচ্ছবি জাগিতেছে—বহ্নি ও চন্দ্রকান্ত—ভগ্নী ও ভ্রাতা।

উগ্রমোহনের অশ্ব যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন গ্রাম নিষুপ্ত। গ্রামের ভিতর কতকগুলি কুকুর অকারণে চীৎকার করিতেছে। একদল শৃগাল ডাকিতে ডাকিতে হঠাৎ একযোগে চুপ করিয়া গেল। তারার আলোয় গ্রামপ্রান্তের তালগাছগুলি রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। কর্কশরবে ডাকিতে ডাকিতে একটা পেচক উড়িয়া গেল। রাত্রির অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিল। ঘোড়ার উপর হইতে উগ্রমোহন দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রকান্তের খাস-কামরায় এখনও আলো জ্বলিতেছে। চন্দ্রকান্ত এখনও জাগিয়া আছে নাকি? একদান দাবা খেলিয়া গেলে কেমন হয়? উগ্রমোহন অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। চন্দ্রকান্তের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন, দেউড়ি তখনও বন্ধ হয় নাই। উগ্রমোহনের অশ্ব আসিয়া দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে গুর্খা

প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রকান্ত কোথায়?

বাবুসাব আভি বাহার নিক্‌লে হেঁ।

সওয়ারি পর?

জী নেহি। পয়দল।

হামারা সেলাম কহ দেনা।

জী হুজুর।—গুর্খা সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন আবার অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। উগ্রমোহনের অশ্ব যখন চন্দ্রকান্তের বাড়ির সীমানা ছাড়াইতেছে, চন্দ্রকান্ত তখন নিজের বাগানের অর্কিড-হাউসে গোপনে বসিযা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতেছিলেন। ছদ্মবেশ-গ্রহণে চন্দ্রকান্তের অসাধারণ পারদর্শিতা। সঙ্গীতবিদ্যার মত এই বিদ্যাটিও তিনি বহু কৌশলে ও বহু অর্থব্যয় করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন। যখনই সকলের অগোচরে কোন কার্য করার তাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেন। অর্কিড-হাউস হইতে সহজভাবে বাহিরে আসিলেন। গেটে প্রবেশ করিতেই গুর্খা আসিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইল যে, উগ্রমোহনবাবু আসিয়াছিলেন এবং সেলাম জানাইয়া গিয়াছেন। আচ্ছা।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত ভিতরে চলিয়া গেলেন। তখনও তাঁহার রাগের শির দুইটা দপদপ করিতেছে। তিনি ওপারে গিয়াছিলেন।

বেদেনীর নাম ফুলকি। সত্যই আগুনের ফুলকি। ওপারেও সে একদল দর্শকের সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল, যেন এক সর্পিণী

ফণা বিস্তার করিয়া আবেগে কাঁপিতেছে। তাহার খিলখিল হাসি চন্দ্রকান্ত এখনও যেন শুনিতে পাইতেছেন।

টেবিলের উপর নীল রঙের ডোম দেওয়া একটি সুদৃশ্য বাতি কমানো আছে। ধূপাধারের ধূপ তখনও পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ক্ষীণ ধূমরেখায় অগুরুর গন্ধ তখনও পুড়িয়া পুড়িয়া আপনাকে বিলাইতেছে। চন্দ্রকান্ত এস্রাজটি নামাইয়া কানাড়ায় গান ধরিলেন, আনন্দন আনন্দ ভয়ো—

উগ্রমোহন যখন বাড়ি পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার খাস-চাকর ব্রজ ছাড়া আর কেহ জাগিয়া ছিল না। ঘোড়া হইতে নামিতেই ব্রজ আসিয়া ঘোড়া ,ধরিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া সোজা তিনি অন্দর-মহলে চলিয়া গেলেন। নৈশ প্রহরী তাঁহাকে অভিবাদন করিল, তাহা তিনি দেখিতেও পাইলেন না।

ভিতরে গিয়া তিনি দেখিলেন, বহ্নির ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। দালানের ঘড়িটা হইতে শুধু টক-টক-টক শব্দ হইতেছে।

নিঃশব্দপদচসঞ্চারে উগ্রমোহন বহ্নি দেবীর ঘরের সম্মুখে উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বার ভেজানো ছিল। ভিতর হইতে কোনও শব্দ নাই। মৃদু করাঘাত করিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন। দেখিলেন, বহ্নি দেবী কার্পেটে কি যেন বুনিতেছেন।

উগ্রমোহন কহিলেন, এখনও জেগে আছ দেখছি। বুনছ কি?

জুতো।

লেখাপড়া সঙ্গীত-চর্চা সব ছেড়ে হঠাৎ এ কি?

বহ্নি দেবীর নয়নে একটা ক্ষণিক দীপ্তি ফুটিয়া নিবিয়া গেল। তিনি উত্তর দিলেন, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

উগ্রমোহন পাগড়িটা খুলিয়া রাখিতে রাখিতে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, একটা গান শুনতে ইচ্ছে করছে এখন।

বহ্নিকুমারীর গম্ভীর মুখে একটা হাসির আভা ফুটি-ফুটি করিতে লাগিল। তিনি কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনে বুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

উগ্রমোহন আবার কথা কহিলেন, কতক্ষণ বুনবে?

বহ্নিকুমারী হাসিয়া কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শব্দ হইল—হুম্ ব্রো, হুম্ ব্রো, হুম্ ব্রো।

এ কি, চন্দ্রকান্ত এল নাকি?

উগ্রমোহন নামিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, তুমি গিয়ে ফিরে এসেছ শুনলাম। এস, একদান বসা যাক।

দুইজনে দাবার ছক লইয়া মুখামুখি বসিলেন।

বহ্নি দেবী অন্দর-মহলে একা বসিয়া বুনিতে লাগিলেন।

তাঁহার মুখের উদীয়মান হাসিটি নিবিয়া গেল।

১৪

অতি প্রত্যুষেই উগ্রমোহন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না। রাণী বহ্নিকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং দুই ডালা পদ্মফুল লইয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ির উদ্দেশে পালকিযোগে যাত্রা করিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। তাঁহার পালকি আবৃত করিয়া লাল মখমলের একটি আস্তরণ। তাহার সোনালী ঝালর প্রভাতের স্বর্ণ-কিরণে ঝলমল করিতে লাগিল। তাঁহার পশ্চাতে একটি সাধারণ পালকিতে তাঁহার দুইজন দাসীও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়াছে।

চন্দ্রকান্তের বাড়িতে সরস্বতী-পূজার একটু বৈচিত্র্য আছে। চন্দ্রকান্ত রায়ের অন্দর-মহলে এক প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। অনেক রকম ফুল। জাতী, যুথী, জবা, টগর হইতে আরম্ভ করিয়া গোলাপ, রজনীগন্ধা, ক্রিসান্‌থিমাম, এমন কি পিটুনিয়া, ডালিয়া, ভায়োলেট, সুইট পি প্রভৃতি বিলাতী মরসুমী ফুলেরও প্রাচুর্য সেখানে। এই বৃহৎ উদ্যানের মধ্যস্থলে বিশাল এক দীর্ঘিকা। ঘন কালো তাহার জল পদ্মফুলে ভরা। সেই দীঘির মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরের প্রকাণ্ড একটি মঞ্চ এবং সেই মঞ্চকে আচ্ছাদন করিয়া সুন্দর শ্বেত-মর্মরের প্রকাণ্ড এক পদ্মফুল, তাহার মর্মর-নির্মিত মনোরম মৃণালটি জলের ভিতর হইতে বাঁকিয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রকান্তের সরস্বতীর প্রতিমা দীর্ঘিকা-মধ্যবর্তী এই মঞ্চে স্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরের অনিন্দ্যকান্তি প্রতিমা। কিন্তু পূজার দিন মঞ্চে শুধু প্রতিমাই থাকে না। পৃথিবীর যেখানে যত জ্ঞানী, গুণী, বিদ্যানুরাগী আছেন বা ছিলেন, সকলেরই ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিকৃতির সমাবেশ সেখানে হয়। তাহা ছাড়া পূজার দিন সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেই মঞ্চের চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ সেতারী, বীণকার, এস্রারী রাগ-রাগিণীর আলাপে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তোলেন। সরস্বতীর পূজারী চন্দ্রকান্ত স্বয়ং। চন্দ্রকান্তের হুকুম, পারতপক্ষে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে সেদিন যেন তাঁহাকে বিরক্ত করা না হয়। আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বাণী-অর্চনায় তিনি যাহাকে-তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন না। এই উপলক্ষ্যে বাণীর একনিষ্ঠ সাধকগণকেই তিনি প্রতি বৎসর আহ্বান করিয়া থাকেন। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেবল গঙ্গাগোবিন্দ এবং রাণী বহ্নিকুমারী নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ নয়। বাণীর সাধনায় সত্যকার আগ্রহের পরিচয় না থাকিলে চন্দ্রকান্তের আয়োজিত বাণীপূজায় নৈবেদ্য সাজাইবার আহ্বান মেলে না।

বাতাসপুর গ্রামের দরিদ্র সারেঙ্গী-বাদককে চন্দ্রকান্ত সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু হাই স্কুলের হেডমাস্টারকে নয়। ইহা লইয়া বহু নিন্দা সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রকান্তের মত পরিবর্তিত হয় নাই।

আজ সকাল হইতে তিন-চারিটি ছোট ছোট হালকা পানসি দীঘিতে ভাসিতেছে, অতিথিগণ আসিলে সেই পানসি করিয়া

তাঁহাদিগকে পূজামঞ্চে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাঁহারা অঞ্জলি দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, কেহ বা পানসি লইয়া দীঘিতে বেড়াইতেছেন। রাণী বহ্নিকুমারী আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইতেই গঙ্গাগোবিন্দ একখানি পানসি বাহিয়া হাসিমুখে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণী বহ্নিকুমারীও স্মিতমুখে গঙ্গাগোবিন্দের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আকাশে বাতাসে শ্রীপঞ্চমীর শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধূপ ধূনা ফুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। গঙ্গাগোবিন্দ পানসি বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে লাগিলেন, মহিমময়ী মূর্তিতে বাণী দাঁড়াইয়া আছেন। পট্টবস্ত্রের টকটকে লাল পাড়, সীমন্তে রক্তবর্ণ সিন্দূর, হস্তে কমলকলি। বহ্নিকুমারী ভাবিতেছিলেন, আহা, গঙ্গাগোবিন্দ রোগা হইয়া গিয়াছেন। পানসি ঘাটে লাগাইয়া গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, বাণী এস। বহ্নিকুমারী হাসিয়া উত্তর দিলেন, বাণী মারা গেছে। আমি এখন বহ্নি।

তোমার নূতন নামটা মনেই থাকে না।

পরস্ত্রীর নাম মনে না থাকাই ভাল।

বহ্নিকুমারী পানসিতে উঠিলেন। পানসি মঞ্চের দিকে ভাসিয়া চলিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। গঙ্গাগোবিন্দ ধীরে ধীরে বলিলেন, আমাকে কি এখনও ক্ষমা কর নি বাণী ?

বহ্নিকুমারীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, আজও সে কথা ভোল নি দেখছি! আশ্চর্য তোমার স্মরণশক্তি!

না, ভুলি নি।—বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া

রহিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের কাউকেই ভুলতে পারছি না। ভুলতে দিচ্ছ কই তোমরা!

বহ্নিকুমারীর ভ্রূলতা অকুঞ্চিত হইল। কানের হীরার দুল দুইটি সূর্যকিরণে জ্বলিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্থাৎ?

তুমি জান না?

কি জানি না?

গঙ্গাগোবিন্দ কিছু না বলিয়া নীরবে দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। তাহার পর বহ্নির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এ কথা তোমার তো না জানবার নয় যে, তোমার স্বামী আমার মেয়ে দুটিকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এ কথা বহ্নিকুমারী সত্যই শোনেন নাই। স্বামীর এই কার্য তাঁহার নিকট অত্যন্ত হীন বলিয়া ঠেকিল। তাঁহার আত্মসম্মানে যেন আঘাত লাগিল, গঙ্গাগোবিন্দের কাছে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মুখে তিনি কিন্তু বলিলেন, সবলের কাছে বলই একমাত্র যুক্তি। দুর্বলের যুক্তি ক্রন্দন।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, আমি দুর্বল নই, ক্রন্দন আমি করছি না, গল্পটা তোমায় শোনালাম।

বহ্নিকুমারী অকস্মাৎ বলিয়া বসিলেন, এই কি তোমার গল্প শোনানো? আড়ালে স্বামীর নিন্দা ক'রে স্ত্রীর কাছে

বাহাদুরি নেওয়ার বাসনা! মেয়ের বিয়ে একদিন তোমায় দিতেই হবে। আমার স্বামী সৎপাত্র দেখে সেই বিবাহ ঘটিয়ে দিচ্ছেন, এত বড় তোমার গর্ব যে, তাতে কৃতজ্ঞতা বোধ না ক'রে তুমি রাগ করছ। স্পর্ধারও সীমা থাকা উচিত।

গঙ্গাগোবিন্দ এই তেজস্বিনীকে চিনিতেন। বাণী যে তাঁহার বাল্যসহচরী! গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, রাগ ক'রো না বাণী। আমার কথাটা ভেবে দেখ।

বহ্নিকুমারী বলিলেন, তুমিও ভেবে দেখ, তিনি আমার স্বামী।

পানসি আসিয়া পূজামঞ্চে ভিড়িল।

বাণী ও গঙ্গাগোবিন্দ নামিয়া অঞ্জলি দিতে গেলেন।

অঞ্জলি দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্ত বিভোর হইয়া সারেঙ্গীর আলাপ শুনিতেছেন। বহ্নিকুমারী পূজা সমাপন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ একা বসিয়া ভাবিতেছেন, বাণীর সহিত কত কাল পরে দেখা! সেই বাণী, যিনি একদিন তাঁহার গলায় জোর করিয়া একছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আমার বর, সেই বাণী আজ প্রবলপরাক্রান্ত উগ্রমোহনের স্ত্রী রাণী বহ্নিকুমারী! বাণী গঙ্গাগোবিন্দের জীবনের প্রথম প্রেম। নিষ্কলঙ্ক শুভ্র। আজ এতদিন পরে তাঁহার সহিত দেখা হইল বটে, কিন্তু তিনি ঝগড়া করিয়া বসিলেন! ছি ছি, কাজটা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। আর জীবনে হয়তো তাঁহার সহিত দেখাই হইবে

না। গঙ্গাগোবিন্দও যে বাণীকে ভালবাসেন, তাহা কি বাণী জানেন? কোন দিনও তো তিনি তাহা জানান নাই। বাণী তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বড়লোকের মেয়ে বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। বড়লোকের মেয়ে হওয়াটা কি অপরাধ? হঠাৎ গঙ্গাগোবিন্দের চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। ভজনা খানসামা ঘাটের উপর হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে দেখা গেল। কেন? কি হইল?

পানসি বাহিয়া ঘাটের কাছে গিয়া শুনিলেন যে, বাহিরে কমলাক্ষবাবু বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাঘাঢ় বিল জলকর উগ্রমোহনের সিপাহীরা নির্মমভাবে লুণ্ঠন করিতেছে। দশজন লোক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া চন্দ্রকান্তকে খবর দিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, আঃ, আজকের দিনেও জ্বালাবে উগ্রমোহন? থানায় খবর দিতে বল। আমি কি করব?

কমলাক্ষবাবু ইহাই চাহিতেছিলেন।

১৫

বাঘাঢ় বিল জঙ্গলে ভীষণ দাঙ্গা। উভয় পক্ষে প্রায় পঁচিশ-জন আহত হইয়াছে। দুধনাথ পাঁড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পাইয়াছে; অচেতন অবস্থায় তাহাকে সদর-হাসপাতালে ডুলি করিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্তের প্রায় পঞ্চাশজন সিপাহী, থানার দারোগা, কনস্টেবল, চৌকিদার—সকলে ঘটনাস্থলে

উপস্থিত। দাঙ্গা তথাপি চলিতেছে। নানারূপ সত্য মিথ্যা গুজব আশেপাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কেহ বলিতেছে, উগ্রমোহনবাবু স্বয়ং বর্শা-হস্তে ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ লোকেরই মত যে, সম্পত্তিটা আসলে উগ্রমোহন সিংহেরই পূর্বপুরুষদের ছিল। চন্দ্রকান্তের পিতামহ কি কৌশলে জলকরটাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, উগ্রমোহন সিংহ হঠাৎ তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাই এই কাণ্ড। তিনি মরদ্‌কা বাচ্চা, ছাড়িবেন কেন? কথাটা হইতেছিল পীরপুরের গোলোক সার বাসায়। গোলোক সা লোকটি নিঃসন্তান। দুই বার বিবাহ করিয়াও সংসার স্থাপন করিতে পারে নাই। তাহার দ্বিতীয়া পত্নীটিও বৎসর দুই আগে মারা গিয়াছে। গোলোক সার থাকিবার মধ্যে আছে তেজারতি-কারবার, তাহা প্রায় লাখ খানেক টাকার। আর আছে এক যমজ ভাই, কিন্তু সেও বহুদিন হইল গোলোকের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছে। অনেকেরই ধারণা, সে মারা গিয়াছে। এখন গোলোক সার চড়া সুদে জমিদারগণকে টাকা ধার দেওয়া জীবিকা। ইহাই তাহার জীবনের বন্ধন এবং কর্মের প্রেরণা। চন্দ্রকান্ত রায়কে টাকা ধার দিবার সুবিধা হইয়াছে বলিয়া সে পীরপুরে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।

উগ্রমোহন সিংহকে মরদ্‌কা বাচ্চা বলিয়া যে লোকটি সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল, সে বৃন্দাবন মোদক। গোলোক সার বাসার সম্মুখে তাহার মুদীখানার দোকান।

গোলোক সা বলিল, মরদ্‌কা বাচ্চা—তুমি তো ফট্‌ ক'রে ব'লে বসলে! কথা বলতে তো আর পয়সা খরচ হয় না! হোঁৎকা হ'লেই মরদ্‌কা বাচ্চা হ'ল? বেশ যা হোক!

বৃন্দাবন মোদক গোলোক সাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিত। সে উত্তর করিল, মরদ্‌কা বাচ্চা যদি কেউ থাকে এ তল্লাটে সে হচ্ছে উগ্রমোহন সিং। এক কথায় ব'লে দিলাম তোমায় সা-জী।

গোলোক সা মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিল, খালি গোঁয়ারের মত মারামারি করলেই মরদ্‌কা বাচ্চা হয় না, বুঝলে? ওর চেয়ে ঢের বেশি মরদ্‌কা বাচ্চা আমাদের চন্দ্রকান্তবাবু।

বৃন্দাবন অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, কিসে আর কিসে, সোনা আর সীসে—একটা কথা আছে না? এ হ'ল গিয়ে তাই। সেতারের টুং-টাং করে ব'লে হয়তো তুমি ওকে পছন্দ কর, কিন্তু মরদ্‌কা বাচ্চার জাত ও নয়। হেলে কি কখনও কেউটে হতে পারে?—বলিয়া বৃন্দাবন মোদক ফু-ফু করিয়া ধোঁয়াটা ছাড়িল। সে তামাক খাইতেছিল।

গোলোক সা বলিল, দাও, কলকেটা দাও। ভেতরের কথা তুমি তো আর জান না, আমি জানি। আমি বলছি শোন, আসল মরদ্‌কা বাচ্চা চন্দ্রকান্তবাবু।

এমন সময় অকস্মাৎ দশ-বারোজন সশস্ত্র অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল—হাতে খোলা তলোয়ার। বৃন্দাবন ও গোলোক উভয়েরই চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এ কি কাণ্ড!

বজ্রগর্জনে একজন অশ্বারোহী বলিল, বাঁধো। অমনই

তিন-চারিজন লোক আসিয়া গোলোক সাকে ধরিল। তাহার হাত বাঁধিল, পা বাঁধিল, মুখও বাঁধিল এবং পরিশেষে বাঁধা হাত-পায়ের ভিতর দিয়া একটি বংশদণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিল।

আবার আদেশ হইল, চল।

আটজন লোক গোলোক সাকে শূকরের মত টাঙাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন মোদক ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। থানা পুলিস সব বাঘাঢ় বিলের জঙ্গলে, বাধা দিবার কেহ নাই।

সকল জিনিসেরই একটা শেষ আছে। সুতরাং কিছুক্ষণ কাঁপিয়া বৃন্দাবন মোদকও প্রকৃতিস্থ হইল এবং কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। আশেপাশে আরও দুই-চারিজন লোক এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া জুটিল এবং নানাভাবে জিনিসটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—কেহ উত্তেজিতভাবে, কেহ মৃদুস্বরে, কেহ সহানুভূতি করিয়া। এ ব্যাপারে যে উগ্রমোহন সিংহের হাত আছে, তাহা কাহারও মাথায় আসিল না। একটি রোগা-গোছের ছোকরা আসিয়া বৃন্দাবন মোদককেই সমস্ত ব্যাপারটার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসিল। তাহার যুক্তি এই, বৃন্দাবন মোদক চেঁচাইল না কেন? উত্তেজিত স্বরে যুবকটি বলিতে লাগিল, চেঁচাইলে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়তাম। তা হ'লে কি আর সা-জীকে অমনধারা তুলে নিয়ে যেতে পারে? দিন-দুপুরে একটা

জলজ্যান্ত লোককে বেঁধে তুলে নিয়ে গেল, আর আপনার মুখ দিয়ে একটা বাক্যি বেরুল না!

একজন বৃন্দাবন মোদককে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, লোকগুলো দেখতে কি রকম বল তো?

সবারই চেহারা তো একই রকম, মুখোশ প'রে ছিল, হাতে সব খোলা তলোয়ার।

সেই রোগা-গোছের ছোকরাটি হাসিয়া বলিল, ওই তলোয়ার-টলোয়ার দেখেই আপনি ঘাবড়ে গেছেন, বুঝেছি। একবার যদি একটা হাঁক দিতেন, তা হ'লে—

বৃন্দাবন মোদক এইবার চটিয়াছিল, তুমি থাম তো হে বাপু। সেদিন তো জ্বর থেকে ভুগে উঠলে, পেটে এখনও দিগ্‌গজ পিলে মজুত হয়ে রয়েছে। তোমার এত ফড়ফড়ানি কিসের?

যুবকটি প্রত্যুত্তর দিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। হঠাৎ একজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে বলিয়া গেল, সাবধান! হঠাৎ একদল ডাকাত এসে চারিদিকে লুঠপাট করছে, উগ্রমোহন সিংহের রতনপুর-কাছারি এইমাত্র লুঠ হয়ে গেল। সাবধান!

আকস্মিক এই বার্তায় প্রথমে সকলে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। বাক্যস্ফূর্তি হইল প্রথমে বৃন্দাবন মোদকের। সে সেই রোগা-গোছের ছোকরাকে বলিল, কই হে বীরপুরুষ, তোমার যে আর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না? যাও, ডাকাতের দলকে ঠেকাও গিয়ে, যাও।

যুবকটি চোখ-মুখের এমন একটা ভাব করিল, যেন সে এখনই রতনপুর অভিমুখেই রওনা হইয়া পড়িবে; কিন্তু নিকটেই যুবকটির মাতুল রামকান্ত থাকিতে বোধ করি তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

রামকান্ত যুবককে ডাকিয়া বলিল, ওরে, তুই বাজে কথা ছেড়ে, একবার বাড়ির ভেতর যা দিকিন, তোর মামীকে গয়না-পত্তর সব সিন্দুকে পুরে ফেলতে বল্, আর দেখ্, শোন্।—বলিয়া সে যুবকটিকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া নিম্নস্বরে কি বলিতে লাগিল।

বৃন্দাবন মোদক দেখিল, রামকান্ত নিজের ঘর সামলাইবার ব্যবস্থা করিতেছে এবং তাহা অনুকরণীয়। সে কোমর হইতে চাবিটা বাহির করিয়া দোকান অভিমুখে পা চালাইয়া দিল।

অন্যান্য সকলেও বুঝিল, এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই উচিত, এবং নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় চতুর্দিক থমথম করিতে লাগিল।

দুই পক্ষ গিয়াই থানায় এজাহার দিল। দুই পক্ষ মানে দুই পক্ষের সিপাহীবৃন্দ। দুধনাথ পাঁড়ে অর্থাৎ উগ্রমোহন সিংহের দল গিয়া বলিল যে, তাহারা প্রভু-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রতনপুর-কাছারি যাইতেছিল। কিন্তু পথে বাঘাড় বিল পড়ায় তাহারা স্নানাদি সারিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যেই নিতান্ত

ভালমানুষের মতই বিলে নামিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্তবাবুর এক সিপাহী রামবৃছ্ সিং তদ্দর্শনে অনর্থক তাহাদের গালিগালাজ করিতে থাকে এবং অকারণে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করে। ঠিক অকারণেও বলা যায় না। রামবৃছ্ সিং কিছুদিন পূর্বে উগ্রমোহন সিংহের নিকট চাকরির আশায় গিয়াছিল, কিন্তু দুধনাথ পাঁড়ের জন্য তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। দুধনাথ পাঁড়ের উপর তাই তাহার আক্রোশ ছিল। রামবৃছ্ লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া একটি সিপাহীকে আঘাত করে, ইহাই দাঙ্গার সূত্রপাত। রামবৃছ্ সিং প্রতিবাদ করিয়া কহিল যে, ব্যাপার একেবারে অন্যরূপ। জলকরে মাছ ধরানো হইতেছিল, দুধনাথ পাঁড়ের আদেশক্রমে কয়েকজন সিপাহী গিয়া ধীবরদের জাল ছিঁড়িয়া দেয় এবং রামবৃছ্ সিং তাহার প্রতিবাদ করিতে গেলে স্বয়ং দুধনাথ পাঁড়ে তাহাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া গণ্ডদেশে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে। সুতরাং দাঙ্গা হয়।

দারোগা সাহেব উভয় পক্ষের বিবৃতি টুকিয়া লইলেন এবং উভয় পক্ষেরই ধৃত দাঙ্গাকারিগণকে চালান দিলেন।

গোলোক-সাহা-হরণ ব্যাপারটা কতকগুলি দুর্ধর্ষ ডাকাতের কার্য বলিয়াই অনুমিত হইল। উগ্রমোহনের রতনপুর-কাছারিতে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়া যাওয়াতে এই বিষয়ে দারোগা সাহেবের অন্য সন্দেহ হইল না। তিনি চৌকিদার, দফাদার, কন্স্টেবল—সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত থাকিতে

বলিয়া ব্যাপারটা সদরে রিপোর্ট করিলেন এবং সেই বেদে-বেদেনীর দলকে গ্রেপ্তার করিলেন।

ফুলকি থানার হাজত-ঘরে গিয়া হাজির হইল।

১৬

উগ্রমোহন সিংহ বাহিনী-নদীর উপর বজরার ছাদে বসিয়া পশ্চিম দিগন্তের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। সূর্য অস্ত যাইতেছে। অস্তরবির কিরণে বন্য স্রোতস্বিনী বাহিনী অপূর্ব শোভায় সাজিয়াছে। নদীর জলে একদল চক্রবাক ভাসিতেছিল। তাহাদের গৈরিক অঙ্গে, বাহিনী-তীরবর্তী শীত-রিক্ত বনশ্রীর পর্ণ-পল্লবে অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণারুণরাগ স্বপ্ন-লোক সৃজন করিয়াছিল। চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া উগ্রমোহন এই চিত্র দেখিতেছিলেন। সুদূর আকাশে শুভ্র বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে—যেন সন্ধ্যার কুন্তলে শ্বেত-পুষ্পের একগাছি মালা।

পদশব্দ শুনিয়া উগ্রমোহন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, অঘোরবাবু আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর?

মানিক মণ্ডল এসেছে।

ডেকে আন এখানে।

মানিক মণ্ডল মূষিকবৎ আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও খবর পেলে?

আজ্ঞে, সঠিক কোনও খবর এখন পর্যন্ত পাই নি। তবে আমার আন্দাজ, ছেলে দুটি টাল-জঙ্গলেই আছে।

কি ক'রে বুঝলে ?

মানিক মণ্ডল চঞ্চল চক্ষু দুইটিতে একটু বুদ্ধির জ্যোতি ফুটাইয়া কহিল, মোহানিয়া ঘাটটা হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন কি না, মাঝি-মাল্লা কেউ নেই সেখানে।

ঘাট বন্ধ আছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উগ্রমোহনের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পাগলী নদী পেরোবার উপায় কি তা হ'লে ? লোক যাচ্ছে কোন্ দিক দিয়ে ?

অঘোরবাবু বলিলেন, মোহানিয়া ঘাট দিয়ে এক টাল ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া যায় না। ওটা ও-তরফের খাস-ঘাট, সরকারী নয়। টাল বনকর তো চন্দ্রকান্তবাবু কাউকে বন্দোবস্ত করেন নি, ওটা খাসেই আছে। সেইজন্যে মোহানিয়া ঘাট বন্ধ করলে সাধারণের কোন অসুবিধা নেই। সাধারণত লোকে পাগলী নদী পার হয় ছর্রামারি ঘাটে, এখান থেকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে।

উগ্রমোহন সিংহ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াই রহিলেন।

হঠাৎ তিনি বলিলেন, মানিক মণ্ডল, তুমি আজ এখানেই থাক। আমি সিপাহী পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি। সিপাহীর মারফত তোমার বাড়িতেও খবর পাঠাও যে, তুমি আজ ফিরবে না। এখন তুমি নীচে গিয়ে ব'স।

মানিক মণ্ডল এইরূপ আদেশের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া একটু আমতা-আমতা করিয়া কহিল, হুজুর আমার মেজো

ছেলেটার জ্বর দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, তা না হ'লে—

উগ্রমোহন বলিলেন, তুমি যে খবর এনে দিচ্ছ, তা ঠিক কি না, তা না জানা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না। সিপাহীরা যদি ফিরে এসে বলে যে, মোহানিয়া ঘাট বন্ধ আছে, তা হ'লে তুমি ছাড়া পাবে, তার আগে নয়। যাও, বিরক্ত ক'রো না।

মানিক মণ্ডল সভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন, তুমি বিশজন সিপাহী পাঠাও। তারা প্রথমে মোহানিয়া ঘাটে যাবে। ঘাট যদি বন্ধ থাকে, একজন ফিরে এসে খবর দেবে। বন্ধ যদি না থাকে, তা হ'লেও এসে খবর দেবে। ঘাট বন্ধ থাকলে ছর্‌রামারি ঘাট দিয়ে পাগলী পেরিয়ে আজ রাত্রেই তারা চন্দ্রকান্তের টাল-কাছারিতে যেন পৌঁছয়। সেখানে যদি মৃন্ময়ের ছেলেরা থাকে, তাদের ছিনিয়ে কেড়ে আনতে হবে। যদি আনতে পারে প্রত্যেককে ভাল করে বখশিশ দেব।—বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অঘোরবাবু নীচে নামিয়া গেলেন।

উগ্রমোহন পশ্চিম দিগন্তের দিকে আবার চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, কিন্তু অস্তরবির আলোক নিবিয়াও যেন নিবে না।

১৭

মিশিরজী মল্লারে গান ধরিয়াছিলেন—

বাদর ঝুমি ঝুমি আয়ে—

একজন তবলায় ঠেকা দিতেছিল। চন্দ্রকান্ত তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি মুদিত। অঙ্গে একখানি সুকোমল বালাপোশ, হাতে আলবোলার নল। চতুর্দিকে অম্বুরি-তামাকের গন্ধ। চন্দ্রকান্ত মাঝে মাঝে আলবোলায় মৃদু টান দিতেছেন। গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় রসভঙ্গ করা ঠিক হইবে না ভাবিয়া কমলাক্ষবাবু ম্যানেজার বাহিরে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। গান যত জমিয়া উঠিতেছে, কমলাক্ষবাবুর অধীরতা ততই বাড়িতেছে। মালিকের সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাঘাড় বিল দাঙ্গা সম্পর্কে উগ্রমোহনবাবুকে আসামী করা সমীচীন কি না, তাহা চন্দ্রকান্তকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। গানটা থামিলেই তিনি কাজটা সারিয়া লইবেন। এদিকে মিশিরজীর গান আর থামে না। তিনি উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়া চলিলেন—

বাদর ঝুমি ঝুমি আয়ে
বরণ বরণ বরষণ প্রাণ প্যারে—

চন্দ্রকান্তবাবু চক্ষু বুজিয়া গান শুনিতেছেন, চিন্তাও করিতেছেন। থানার দারোগা বুঝিতে না পারুক; চন্দ্রকান্ত রায় ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, গোলোক সাকে উগ্রমোহনই ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং পুলিসের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইবার জন্য নিজেই

নিজের রতনপুর-কাছারি লুণ্ঠন করাইয়াছেন। সাধারণ লোক হইলে চন্দ্রকান্ত রায় ভিতরকার ব্যাপারটা নানা বর্ণসমাবেশ-সহকারে এতদিন পুলিসকে জানাইয়া দিতেন। কিন্তু তিনি ভিন্ন জাতের মানুষ। প্রসিদ্ধ দাবা-খেলোয়াড়। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতির অনুসরণ করিয়া এ ব্যাপারের কোন সুরাহা হইতে পারে কি না, তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। টাল-জঙ্গলে মৃন্ময় ঠাকুরের দুই পুত্রকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদেরও অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। দুইটি সমস্যাই জটিল। সুতরাং যদিও মিশিরজী প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেছিলেন এবং তবলাবাদক নিখুঁতভাবে ঝাঁপতাল বাজাইতেছিল, তথাপি চন্দ্রকান্ত সম্পূর্ণ মন দিতে পারিতেছিলেন না। বরং সঙ্গীতের অন্তরালে ব্যাপারটাকে আগাগোড়া ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। গান বন্ধ হইল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা।

কমলাক্ষবাবু ওত পাতিয়া ছিলেন। দ্বারদেশে গলা বাড়াইলেন। গলা বাড়াইতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে একেবারে এস, তোমাকে একবার বেরুতে হবে। বিরিঞ্চিকে হাতীটা কষতে বল। আর দেখ, রাধিকামোহনকে একবার খবর দাও তো। কোথা হইতে কি হইল ভাবিয়া কমলাক্ষবাবু নির্বাক হইয়া গেলেন।

কমলাক্ষবাবু চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত মিশিরজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আর একটা হোক মিশিরজী।

মিশিরজী হাসিয়া বলিলেন, জী হুজুর।

তৎপরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, তব. এক সুরদাসী মল্লার শুনিয়ে। গান্ধার-বর্জিত সুরট্। তবলাবাদকে বলিলেন, বাজাও চৌতাল। সুরদাসী মল্লারে মিশিরজী গান ধরিলেন—

আধো মুখ নীলাম্বর সেঁা ঢাকি
বিথুরী অলক কৈসি হৈ।
এক দিশা মানো মকর চাঁদনী
এক দিশা ঘন বিজুরী ঐসে হরি মন মো হৈ।

মিশিরজীর সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা বিদায় লইলেন। চন্দ্রকান্ত তথাপি এক ভাবেই বসিয়া রহিলেন। রাধিকামোহন আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রকান্ত নিমীলিত নয়নে ধূমপান করিতেছেন। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়াও তিনি চোখ খুলিলেন না দেখিয়া রাধিকামোহন কথা কহিল, হুজুর কি আমায় ডেকেছেন?

চন্দ্রকান্ত চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, ব'স।

রাধিকামোহন উপবেশন করিলে তিনি বলিলেন, আচ্ছা, সেদিন যখন তুমি গোলোক সার কাছে টাকা আনতে যাও, তখন আর কেউ কি ছিল সেখানে?

কোন্খানে?

গোলোক সার বাড়িতে।

আজ্ঞে না।

চন্দ্রকান্ত একটু ভাবিয়া বলিলেন, তা হ'লে কথাটা প্রকাশ

পেল কি ক'রে? গোলোক সা কাউকে বলবে ব'লে তো মনে হয় না।

তখন রাধিকামোহন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, কেন, কথাটা কি প্রকাশ পেয়েছে? আমি যখন টাকাটা জমা করি, তখন আমাদের মাধব গোমস্তা জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে—কোথা থেকে টাকা এল? তাকে অবশ্য আমি বলেছিলাম। হুজুরের তো কোন নিষেধ ছিল না।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তুমি সেই গোমস্তাকে ডেকে দিয়ে যাও।

একটু পরে মাধব ঘোষাল গোমস্তা আসিল। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া চন্দ্রকান্ত জানিতে পারিলেন যে, মানিক মণ্ডলের কাছে সে গল্পটা করিয়াছিল বটে। তাহাকে বিদায় দিয়া চন্দ্রকান্ত আপন মনে একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ—ব্যাপারটা এইবার বোঝা গিয়াছে।

একটু পরেই কমলাক্ষবাবু আসিলেন। তিনি আসিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, দেখ, তুমি এখনই সোজা টালে চ'লে গিয়ে ছেলে দুটোকে নিয়ে আমাদের নবিপুর কাছারিতে এনে রাখ আজ রাত্তিরেই। মোহানিয়া ঘাট কি বন্ধ আছে এখনও?

হ্যাঁ।

বেশ, তুমি হাতীসুদ্ধ সাঁতরে ওপারে যাবে। বুঝলে? সেখানে গিয়ে ছেলেদের কাছে বলবে যে, ভুল ক'রে তাদের তুমি টালে পাঠিয়ে দিয়েছিলে ব'লে লজ্জিত। মাঝির অসুখ

করার জন্যে ঘাট দু'দিন বন্ধ ছিল ব'লে তাদের ফেরবারও বন্দোবস্ত করতে পার নি। এখন তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে হাতী এনেছ। তারপর তারা হাতীতে চড়লে কিছুদূর গিয়ে বলবে যে, মহা মুশকিল, হাতী নবিপুর কাছারির রাস্তা ধরেছে, নিমাইনগরের দিকে কিছুতেই যাবে না। বিরিঞ্চিকে দিয়ে এটা বলাবে। আগে থাকতে শিখিয়ে রেখো তাকে। বিশ্বাস আর তার ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। বুঝলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠিক পারবে তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলিয়া কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়ালের মত প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, দেখ, হাতী তৈরি হ'ল কি না! হ্যাঁ, আর এক কাজ কর। যাবার সময় তুমি থানা হয়ে যাও। দারোগার সঙ্গে আলাপ আছে ?

আছে।

তা হ'লে শোন।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত তাঁহার কানে কানে চুপিচুপি কি একটা বলিয়া দিয়া আবার বলিলেন, বেশি কিছু নয়, মানিক মণ্ডলকে যেন একটু কড়কে দেয়।

আচ্ছা।—বলিয়া কমলাক্ষবাবু বিদায় লইলেন। একটু পরে ঘণ্টার ঢং-ঢং শব্দ করিতে করিতে চন্দ্রকান্ত রায়ের হস্তী মোহানিয়া ঘাট অভিমুখে চলিয়া গেল।

ম্যানেজার চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত সেতারটা পাড়িয়া একটা বেহাগের গৎ আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ

করিবার পর হঠাৎ তিনি বাজনা থামাইয়া হাঁক দিলেন, ওরে ভজনা! ভজনা আসিলে তাহাকে বলিলেন, একটা কাগজ কলম আর দোয়াত নিয়ে আয় তো। ভজনা দপ্তরখানায় কাগজ কলম এবং দোয়াতের সন্ধানে চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত আবার বেহাগে মন দিলেন। ভজনা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, প্রভু তন্ময় হইয়া বাজাইতেছেন। সে সন্তর্পণে কাগজ কলম দোয়াত প্রভুর নিকটে রাখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত জানিতে পর্যন্ত পারিলেন না।

বেহাগ রাগিণীকে নিঙড়াইয়া ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন তিনি সম্মুখে কাগজ কলম এবং দোয়াত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। দুষ্ট বালকের মত তিনি বাম হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া লিখিলেন, গোলোক সাকে ছাড়িয়া না দিলে অজয়-বিজয়কে পাইবে না। চিঠিটা লিখিয়া তিনি আবার ভজনাকে ডাকিলেন। বলিলেন, জমাদার সীতারাম পাঁড়েকে ডেকে আন্।

বৃদ্ধ জমাদার সীতারাম পাঁড়ে আসিলে তিনি বলিলেন, এই চিঠিখানা উগ্রমোহনবাবুর চাকর ব্রজকে দিয়ে আসতে হবে। অথচ ব্রজ যেন জানতে না পারে যে, চিঠিটা আমি লিখেছি। তুমি যেও না, অন্য কোন লোক মারফৎ পাঠাও, সে যেন ব'লে আসে যে, উগ্রমোহনবাবু এলেই যেন চিঠিটা দেওয়া হয়। বুঝলে? সীতারাম পাঁড়ে চন্দ্রকান্তের দিকে মিটিমিটি একবার চাহিয়া হাসিয়া পত্রটি লইয়া প্রস্থান করিল।

সকলে যখন চলিয়া গেল, তখন চন্দ্রকান্ত নিতান্ত একাকী বসিয়া রহিলেন। গান-বাজনা আর ভাল লাগিতেছে না। উগ্রমোহন এখনও ফেরেন নাই, দাবা-খেলা বন্ধ। সহসা চন্দ্রকান্তের মনে হইল, উগ্রমোহন না থাকিলে তাঁহাকে এতদিন বোধ হয় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইত। উগ্রমোহনই তাঁহার জীবনের একমাত্র আশ্রয়—তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা। উগ্রমোহন-রূপ কঠিন প্রস্তরখণ্ডে বারংবার ঘর্ষিত না হইলে চন্দ্রকান্তের বুদ্ধির ছুরিকায় মরিচা ধরিয়া যাইত।

সত্যই চন্দ্রকান্ত পৃথিবীতে একা। পিতা মাতা মারা গিয়াছেন, ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নিজে বিবাহ করেন নাই, সুতরাং আপনার বলিতে আর কে আছে? কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে প্রকাণ্ড জমিদারি এবং তাহার প্রকাণ্ড আয়োজন। কিন্তু তাহাতে কি অন্তর ভরে? অন্তরের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যে সুধা প্রয়োজন, তাহা চন্দ্রকান্তের নাই। তাঁহার জীবনে যে কয়জন নারী দেখা দিয়াছিল, সকলেরই মধ্যে তিনি পণ্য-রমণীর মূর্তি দেখিয়াছেন। সকলেই নিজেকে যেন নিলামে বিক্রয় করিতে চায়, যে ক্রেতা বেশি দাম দিবে ইহারা তাহারই। সভ্য-সমাজে তিনি যতটা দেখিয়াছেন, টাকা দিয়া যেমন জামা কেনা যায়, জুতা কেনা যায়, হাতী কেনা যায়, প্রেমও কেনা যায়।

জামা, জুতা, হাতী, প্রেম—কোনটার সম্বন্ধেই তাঁহার আর মোহ নাই। অন্তরলোকের নির্জন মহাশূন্যে তাঁহার নিঃসঙ্গ আত্মা নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতই একা জ্বলিতেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া চন্দ্রকান্ত ভজনাকে ডাকিলেন। ভজনা আসিল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, ওরে জুতো আর ছড়িটা আন্ তো।

চন্দ্রকান্ত অন্ধকারে একাকী বাহির হইয়া গেলেন। দেউড়ীর সিপাহী ঢং ঢং করিয়া বারোটার ঘণ্টা বাজাইল।

দিনের পৃথিবী ঘুমে মগ্ন, রাত্রির পৃথিবী জাগিয়াছে। দিনের পৃথিবীর সমস্ত আলোক লইয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে। রাত্রির আকাশে কোটি কোটি সূর্য উঠিয়াছে, অন্ধকার তবু যায় না। রাত্রির পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যাইতেছে, অতি মৃদু অব্যক্ত সে ধ্বনি—শব্দহীন অথচ সুস্পষ্ট। দিবসের পৃথিবীতে মানুষের কোলাহল, পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় না।

নদীর তীরে তীরে চন্দ্রকান্ত একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কত কথাই মনে হইতেছে! কত ভাব মনে আসিতেছে, যাহার ভাষা নাই। যাহার ভাষা আছে, তাহা বলিতে ইচ্ছা করে না। গভীর নিশীথে আকাশের দিকে চাহিয়া সমস্ত ভাষা স্তব্ধ হইয়া যায়। বিস্মিত অন্তরে শুধু দুইটি কথা জাগে, আমি কত ক্ষুদ্র, আমি কত বৃহৎ।

সহসা অকারণে চন্দ্রকান্তের সুজাতার কথা মনে হইল। সুজাতার চক্ষু দুইটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, নীরব বেদনা তাহা হইতে ক্ষরিয়া পড়িতেছে। তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রকান্তের সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সুজাতা গেল, আসিল কমলা। সেই দুরন্ত হাস্যমুখী

কমলা। চন্দ্রকান্তের ক্ষুধিত আত্মা অতীতের অন্ধকারে কাহাকে যেন খুঁজিয়া ফিরিতেছে। বেহাগের পদটা মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করিতেছে—

শ্যাম মোরি আঁখন বীচ সমায় রহো
লোগ জানে কজরারে !

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা—সব মিথ্যা। কবির কল্পনা। রাধিকা কল্পনা, কৃষ্ণ কল্পনা, প্রেম কল্পনা। সত্য শুধু কবিত্বটুকু। সত্য শুধু সঙ্গীত, সুরের উন্মাদনা। সেই উন্মাদনায় মাতিয়া পৃথিবীশুদ্ধ লোক রাধার বিরহে কাঁদিয়া মরিতেছে।

মেঘের স্তর ভেদ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিল। অন্ধকারের যবনিকা সরিয়া গেল। রঙ্গমঞ্চে নূতন নট-নটীর সমাগম হইল। স্বচ্ছসলিলা চন্দনা-নদী ও ওপারের শুভ্র বালুচর। ক্ষিপ্রস্রোতা তন্বী চন্দনা যেন কাহার অভিসারে ছুটিয়া চলিয়াছে, ব্যর্থ-প্রেমিক শুভ্র বালুচর স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। বালুচর অনন্ত স্বপ্নে নিমগ্ন। স্বপ্নই তাহার সম্বল। সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কবে বর্ষার বান আসিবে! কূলের বাঁধন ভাঙ্গিয়া আকুল চন্দনা কবে তাহাকে আবিল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিবে! বর্ষা আসে, কিন্তু থাকে না। চন্দনার স্রোতে কত বর্ষা আসিল, কত বর্ষা গেল। বালুচর কতবার ডুবিল, কতবার উঠিল। চন্দনা আজও বহিতেছে, বালুচর আজও জাগিয়া আছে। চিরন্তন কাহিনী।

চন্দ্রকান্ত নদীর ধারে গেলেন। কাছেই একটা জেলেডিঙি হইতে কে গাহিয়া উঠিল—

আধি রাতি রে পাপিহারা
পিয়া পিয়া বোলে—!
পিয়া পিয়া বোলেরে পিয়া
পিয়া গিয়া বিদেশে
কৈসে ভেজু্ রে সন্দেশ।

সেই চিরন্তন বিরহের গান। আকাশ, বাতাস, নদী, বালুচর, মানব-মানবী—সকলের মনে সেই এক সুর, পাইলাম না। যাহাকে চাই, ঠিক লগ্নটিতে তাহাকে পাইলাম না। সে দূরেই রহিয়া গেল। সহসা চন্দ্রকান্তের ফুলকির কথা মনে পড়িল। মেয়েটির সহিত পরিচয় করিয়া দেখিলে হয়। কিন্তু তখনই আবার তাঁহার সমস্ত অন্তর বলিয়া উঠিল, কাছে যাইও না। কাছে গেলেই মোহ টুটিয়া যাইবে। মোহ টুটিয়া গেলেই ফুলকি নিবিয়া যাইবে। সুজাতার কাছে গিয়াছিলে, লাভ কি হইয়াছে? তাহার বণিকবৃত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছ মাত্র। পৃথিবীসুদ্ধ নারীর মনোবৃত্তি হয়তো ওই। কি হইবে এই সার সংগ্রহ করিয়া? তাহার চেয়ে দূর হইতে দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখাই কি ভাল নয়?

ওই ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি জ্বলিতেছে। জ্বলিতেছে এবং নিবিতেছে, দাঁড়াইয়া দেখ। পার তো উহাদের লইয়া কবিতা রচনা কর, সুখ পাইবে। কিন্তু জোনাকিকে ধরিয়া যদি বিশ্লেষণ করিতে যাও, দেখিবে উহা কীটমাত্র। কবিত্ব তখন আর থাকিবে না।

খানিকটা আবছা, খানিকটা অন্ধকার প্রয়োজন। অস্পষ্ট

অজানাকে লইয়া মন স্বপ্ন-রচনা করিতে চায়। সমস্ত জানিতে চাহিও না। সমস্ত জানিতে পারিবে না। সবজান্তা হইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জীবনটা শুধু বিফল হইয়া যাইবে। কত কথাই চন্দ্রকান্তের মনে হইতে লাগিল। একাকী তিনি অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যখন তিনি বাড়ি ফিরিলেন, তখন রাত্রি আর বেশি বাকি নাই। পূর্বাকাশে অরুণাভাস দেখা যাইতেছে। দ্বিধাভরে দুই-একটা পক্ষী ডাকিয়া আবার থামিয়া যাইতেছে। শুইবেন কি না চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, গেটের ভিতর দিয়া গঙ্গাগোবিন্দ প্রবেশ করিতেছেন।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত ভোরে বেরিয়েছ আজ?

গঙ্গাগোবিন্দ কিছু না বলিয়া একটু হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, কিছুদিন আগে উপনিষদে পড়েছিলাম—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো।
রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্থাৎ?

অর্থাৎ, একই অগ্নি দাহ্যবস্তুর রূপভেদে যেমন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, একই অন্তরাত্মা তেমনই বস্তুভেদে নানা মূর্তিতে প্রকাশিত হন। এর সত্যতা আজ উপলব্ধি করছি।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, হেঁয়ালি বুঝতে পারছি না।

গঙ্গাগোবিন্দ হাসিলেন। বলিলেন, জাগরণের জগতে যে ব্যক্তি অতি রূঢ়, স্বপ্নের জগতে সে অতি কোমল। আজ তার প্রমাণ পেয়েছি।

কি প্রমাণ?

এইমাত্র একটা স্বপ্ন দেখে উঠে আসছি।

কি স্বপ্ন?

বাণীকে স্বপ্ন দেখলাম, অর্থাৎ রাণী বহ্নিকুমারীকে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই না কি?

১৮

উগ্রমোহন সিংহ এত বিস্মিত জীবনে আর কখনও হন নাই।

মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয় হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। নানাবিধ চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু সাফল্যের চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। গতকল্য তাঁহার সিপাহীগণ আসিয়া খবর দিয়াছে যে, টাল-জঙ্গলে কেহ নাই। চন্দ্রকান্তবাবুর একজন সিপাহীর মুখে তাহারা শোনে যে, মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদের লইয়া কমলাক্ষবাবু হস্তী-পৃষ্ঠে নিমাইনগরে যাত্রা করিয়াছেন। এই শুনিয়া সিপাহীরা নিমাইনগরে গিয়াছিল, কিন্তু সেখানেও কেহ নাই।

মৃন্ময় ঠাকুর কিছুক্ষণ পূর্বে দুইজন সিপাহী সমভিব্যবহারে পুত্র-অপহরণের জন্য কমলাক্ষবাবুর নামে নালিশ করিতে

থানায় গিয়াছেন। থানার শরণাপন্ন হওয়া উগ্রমোহন সিংহের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের আগ্রহাতিশয্যে এবং গত্যন্তর না থাকায় অগত্যা তিনি রাজী হইয়াছিলেন।

যম-জঙ্গল কাছারির পার্শ্ববর্তী বনপথে উগ্রমোহন সিংহ তাঁহার প্রাত্যহিক প্রাতঃকালিক ব্যায়ামান্তে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার মনে সুখ নাই, মুখে চিন্তার রেখা।

তিন দিন তিনি বাড়ি ফেরেন নাই। বজরায়, অশ্বপৃষ্ঠে, বাথানে, যম-জঙ্গলে ঝটিকার মত তিনি ছুটিয়া ফিরিয়াছেন। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়ের নাগাল পান নাই।

অঘোরবাবুরও পরামর্শ তিনি পাইতেছেন না। দিনের বেলা বাথানে অঘোরবাবু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন। রাত্রে তাঁহাকে গোলোক সার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। গোলোক সা চামা-প্রান্তরের কালীবাড়িতে বন্দী অবস্থায় বাস করিতেছে। চামা একটি চারক্রোশব্যাপী বিরাট মাঠ। যতদূর দৃষ্টি যায়, উষর প্রান্তর ছাড়া সেখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না, দৃষ্টি চক্রবালরেখায় থামিয়া যায়। চামা-প্রান্তরে লোক-চলাচল নাই। এই মাঠ সম্বন্ধে এমন সব অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে, যাহা শুনিলে যে কোন সাধারণ লোকেরই হৃৎকম্প হইবার কথা। ভূত, প্রেত, পিশাচ অহরহনা কি ওই প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়! কত লোক পথহারা হইয়া এই প্রান্তরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে! এই প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—মহাকালী। মাঠের ঠিক মধ্যস্থলে মহাকালীর একটি মন্দির। মন্দিরটি বহু প্রাচীন, মহাকালীর

মূর্তিটিও ভীষণদর্শনা। কে এই মন্দির নির্মাণ করিয়া এই নির্জন প্রান্তরে কালীমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিল, তাহা জানা নাই। চামা-প্রান্তর বর্তমানে উগ্রমোহন সিংহের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। একজন বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ-সিপাহী এই মন্দিরের রক্ষক এবং কালীর পূজারী। এই মন্দিরের সংলগ্ন একটি কক্ষে উপস্থিত গোলোক সা বন্দী অবস্থায় আছে।

উগ্রমোহন সিংহ একাকী বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে নানা উদ্ভট ও অসম্ভব কল্পনা জাগিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, যদি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির সহিত অজয়-বিজয়ের বিবাহ না হয়, তাহা হইলে তিনি ওই বিস্ফারিত-চক্ষু মৃন্ময়কে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্ন মুণ্ডটা চন্দ্রকান্তকে উপহার পাঠাইয়া দিবেন। অবার তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইতেছিল, মৃন্ময়ের দোষ কি? তিনি তো কোন আপত্তি আর করিতেছেন না! বরং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থানায় গিয়াছেন পুত্রদের সন্ধান-কামনায়।

কমলাক্ষ লোকটিকে গুম করিয়া দিলে কেমন হয়? ভিখন তেওয়ারী আসিয়া তাঁহার চিন্তাধারা বিঘ্নিত করিল। কহিল, চন্দ্রকান্তবাবুর নিকট হইতে এই খত অর্থাৎ চিঠি আসিয়াছে। পত্র পড়িয়া উগ্রমোহন অবাক হইয়া গেলেন। পত্রে আছে—

বন্ধু,

তোমার ভাবী নাতজামাইগণ তোমার নাতিনীদ্বয়কে দেখিবার সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বাড়ি হইতে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমক্রমে তাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া

বেড়াইয়াছে। ভ্রমণ-কাহিনীটা উহাদের মুখেই শুনিতে পাইবে। বিবাহ শুনিয়াছি তেইশে মাঘ। এই বিবাহ উপলক্ষ্যেই লক্ষ্ণৌ হইতে বাইজী আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। মীর সাহেবও আসিবেন। এই সুযোগে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা মন্দ কি? তুমি কবে ফিরিতেছ? বহুদিন দাবা-খেলা বন্ধ আছে।

চন্দ্রকান্ত

উগ্রমোহন আসিতেই অজয়-বিজয় আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি দেখিলেন, চন্দ্রকান্তের পালকি করিয়া তাহারা আসিয়াছে। বিস্মিত উগ্রমোহন বুঝিতেই পারিলেন না, কেমন করিয়া কি ঘটিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত রায়ও কম বিস্মিত হন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন, মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়। উহাদের হস্তেই তিনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে সম্প্রদান করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেদিন ভোরে স্বপ্ন দেখিবার পর অকস্মাৎ তাঁহার মত বদলাইয়া গিয়াছে।

মানুষের মতামত কখন কোন্ কারণে যে কি করিয়া বদলায়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

উগ্রমোহন অজয়-বিজয়কে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহাদের বসাইয়া তিনি চন্দ্রকান্তকে একখানি পত্র লিখিলেন—

ভাই চন্দ্রকান্ত,

অজয়-বিজয় নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছে। তাহাদের ভ্রমণকাহিনী

আমি জানি। নাচগানের বন্দোবস্ত করিয়া ভালই করিয়াছ। আজই রাত্রে ফিরিব।

উগ্রমোহন

পুনশ্চ। তুমি বাইজী আনাইবার বন্দোবস্ত কর, আমি আসর সাজাইবার ভার লইলাম।

চিঠি লইয়া চন্দ্রকান্তের সিপাহী ফিরিয়া গেলে পালকি করিয়া অজয়-বিজয়কে তিনি সদরে, অর্থাৎ নিজ বাটিতে পাঠাইলেন। সকলে চলিয়া গেলে উগ্রমোহন দেহে ও মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

অজয়-বিজয়কে শেষকালে চন্দ্রকান্ত ফিরাইয়া দিল। ভয় খাইয়া, না, অনুগ্রহ করিয়া?—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কিছুতেই ঠিক করিতে না পারিয়া অশ্বারোহণে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেইদিন রাত্রে উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত দাবা লইয়া বসিলেন। বহুকাল এরূপ খেলা তাঁহারা খেলেন নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দাবার ছকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নিস্পন্দভাবে দুই জনে বসিয়া আছেন।

১৯

রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া দুই পরাক্রান্ত জমিদার উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতা হইতে গোরার বাদ্য, লক্ষ্ণৌ হইতে হাসীনা বাইজী,

আগ্রা হইতে সেতারী মীর সাহেব এবং কাশী হইতে কয়েকজন বিখ্যাত কুস্তিগীর পালোয়ান আসিয়াছেন। দুই জমিদারের এলাকায় যত ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশী ও খঞ্জনী ছিল—সব আসিয়া জুটিয়াছে এবং বিচিত্র শব্দসমন্বয়ে চতুর্দিক সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামের ঠিক বাহিরে যত ফাঁকা জায়গা ছিল, তাঁবুতে ভরিয়া গিয়াছে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তের সম্মানিত অতিথিবর্গ তাঁবুগুলিতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক তাঁবুতে পৃথকভাবে পাচক, ভৃত্য এবং রেন্ধনর বন্দোবস্ত আছে। অতিথিদের অভিরুচিমত স্নানাহারের যেন ত্রুটি না হয়। ভাণ্ডারীগণ প্রয়োজন ও ফরমায়েশ মত প্রতি তাঁবুতে সিধা দিয়া ফিরিতেছে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত নিজেরা প্রতি তাঁবুতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলাপ-আপ্যায়ন করিতেছেন। উভয়েরই কাছারি-বাড়িতে প্রকাণ্ড আটচালার নীচে সারি সারি ভিয়ান বসিয়া গিয়াছে। দিবারাত্র আহারের আয়োজন। চতুর্দিকেই দীয়তাং ভুজ্যতাং। উভয় পক্ষেই নায়েব গোমস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া চাকর ঠাকুর সকলেরই গলা ভাঙিয়াছে। একদল সাঁওতাল যুবক-যুবতী মহানন্দে নাচ জুড়িয়া দিয়াছে। সারি বাঁধিয়া মাদলের তালে তালে গান গাহিয়া তাহারা একদল অতিথিকে সন্তুষ্ট করিতেছে। কোনখানে আবার মহাসমারোহে ঝুমুর জমিয়া উঠিয়াছে। সেখানেও একদল মুগ্ধ দর্শক। সুখপুর গ্রামের রামলীলার দলও এই সুযোগে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে ছাড়ে নাই। হনুমানের অভিনয় সত্যই উপভোগ্য। বহু

লোক সেখানে ভিড় করিয়াছে। উগ্রমোহন সিংহ এবং চন্দ্রকান্ত রায়ের সর্বসুদ্ধ ছয়টি হস্তী-হস্তিনী আছে। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ উপলক্ষ্যে তাহারা বিচিত্র সাজে সাজিয়াছে। কাহারও পিঠে হাওদা, কাহারও পিঠে সোনার কাজ-করা মখমলের বিস্তৃত আস্তরণ ঢুলিতেছে। কেহ বাজনার তালে তালে গা দোলাইতেছে, কেহ বিশাল দন্ত-গৌরবে সকলকে ভীত-চমৎকৃত করিতেছে। তাহাদের মাথায় কপালে তৈল ও বর্ণ সহযোগে নানাপ্রকার চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছে।

মাহুতগণেরও পোশাকের আজ পারিপাট্য। হেই-ধেৎ-বিরি প্রভৃতি বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহারা কাজে অকাজে হস্তীদলকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

নানা বর্ণের বিশালকায় অশ্বগুলি সুসজ্জিত। রামপ্রসাদ নামক সিপাহী একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্বিনীপৃষ্ঠে চড়িয়া ব্যাণ্ড-বাদকের নিকট গিয়া নিজের পারদর্শিতা দেখাইতেছে। ব্যাণ্ডের তালে তালে অশ্বিনী গ্রীবাভঙ্গীসহকারে এমন নৃত্য করিতেছে যে, সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে।

উগ্রমোহন সিংহের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে কাশী হইতে সমাগত পালোয়ানবৃন্দ মহা-উৎসাহে কুস্তি শুরু করিয়াছে। দুইজন ভীমকায় পালোয়ান মহাপরাক্রমে মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত। যুযুধান বীরগণকে ঘিরিয়া একদল বিস্মিত দর্শক।

কিছুদূরে উগ্রমোহন সিংহের নির্দেশমত প্রকাণ্ড একটি সামিয়ানা টাঙাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। অক্ষয় গোমস্তা পনরো-কুড়িজন মজুর লইয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া

দিয়াছে। যদিও রাত্রি বারোটার পর এই সামিয়ানাতলে হাসীনা বাইজী অবতীর্ণা হইবে, কিন্তু মালিকের হুকুম যে, সন্ধ্যার মধ্যেই যেন সামিয়ানা টাঙানো শেষ হইয়া যায়। সুতরাং অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রকান্ত টিয়াডাঙ্গার জমিদারের তাঁবুতে বসিয়া আছেন।

টিয়াডাঙ্গার জমিদার গীতবাদ্যের একজন গুণী সমঝদার। সুবিখ্যাত সেতারী মীর সাহেবের সেতারের বৈঠক তাঁহারই তাঁবুতে বসিয়াছে। গ্রামের তবলাবাদক বিষ্ণুপদ বাহাদুরি করিয়া মীর সাহেবের সহিত বাজাইতে গিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছে। মীর সাহেব কৃপা-মিশ্রিত হাস্যের সহিত তাহাকে সংশোধন করিয়া লইতেছেন। মীর সাহেবের খাস তবলচী করিম খাঁ বিষ্ণুপদর এতাদৃশ অবস্থাসঙ্কট দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

পার্শ্ববর্তী একটি তাঁবুতে তাস-খেলা চলিতেছে। খেলাত-গঞ্জের চৌধুরীবাবুদের বাড়ির ছেলেরা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সমাগত তাঁহাদের জামাইবাবুকে তাস-খেলায় কোণঠেসা করিয়া তাঁহারা মহা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। একজন খেলোয়াড় একখানা হরতনের আটা চাপড়াইয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, নহলাখানা কেমন আটকাচ্ছেন এবার দেখি—হ্যাঁ হ্যাঁ—

হাস্যের কলরব উঠিতেছে।

নিকটবর্তী আর একটি তাঁবুতে স্বয়ং উগ্রমোহন সিংহ চিকনহাটির চিকিৎসক বিশ্বম্ভরবাবুর সহিত পাঞ্জা ধরিয়াছেন।

বিশ্বম্ভরবাবু নাকি পাঞ্জাতে অজেয়। কেহ কাহাকেও এখনও হারাইতে পারেন নাই। দম বন্ধ করিয়া দুই-চারিজন অতিথি তাহাই দেখিতেছেন।

মিশিরজী আসর জমাইয়াছেন আর একটি তাঁবুতে। সেখানে কাঁটাগাছির জমিদার স্বয়ং তবলা ধরিয়াছেন, এবং তাঁহার মোসাহেব মুরারিমোহন অতিরিক্ত মাত্রায় কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ করিতেছে।

বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। দুই জন প্রবল জমিদারের কুটুম্বিতা লাভ করিয়া মৃন্ময় ঠাকুর মনে মনে মহা খুশী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু একটু রসভঙ্গ হইয়া গেল। উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে নগদ পাচ হাজার টাকা পণের সহিত এক পাটি ছেঁড়া চটিজুতাও দান করিয়া বসিলেন। মৃন্ময় ঠাকুর ব্যাপারটা নাতজামাইদের প্রতি রসিকতা হিসাবে ধরিয়া লইয়া যদিও দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া ফেলিলেন এবং অন্তর্নিহিত তীব্র খোঁচাটাকে লঘু করিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াসটা যে সফল হইল না, তাহা তাঁহার দন্তসর্বস্ব হাসিই প্রকাশ করিয়া দিল।

দ্বিতীয় বার রসভঙ্গ হইল বাইজীর আসরে। আসর সাজাইবার ভার ছিল উগ্রমোহনের উপর। তিনি প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙাইয়াছেন—ঝালর-দেওয়া চমৎকার সামিয়ানা। বংশদণ্ডগুলি রূপালী জরির কাজ-করা লাল কাপড় দিয়া

মোড়া। আসরে আতরদান, গোলাপপাশ, ফুলের তোড়া, পানের দোনা, শাখা-প্রশাখাময় বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন, সুদৃশ্য মকমলের তাকিয়া, সুকোমল গালিচা—কোন কিছুরই অভাব ছিল না।

কিন্তু বাইজী গান জমাইতে পারিল না। তাহার কারণ, আসরের চারিদিকে উগ্রমোহন পাখী টাঙাইয়া দিয়াছিলেন। উগ্রমোহনের পাখী পোষার প্রচণ্ড শখ। বহু খরচ করিয়া বহুপ্রকার পক্ষী তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার এত পাখী আছে যে, তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে একজন পাখীর দারোগাই রাখিতে হইয়াছে। সেই সব পাখীকে আজ তিনি আসরের চারিদিকে টাঙাইয়া দিয়াছেন। সুদৃশ্য বহু পিঞ্জর চতুর্দিকে ঝুলিতেছে। সেই পিঞ্জরের কোনটাতে শ্যামা, কোনটাতে ভিংরাজ, কোনটাতে তোতা, মুরি, হীরামন, কিরকিচ, খাক্নুর, কাকাতুয়া, কেনেরি, বুলবুল-হাজার-দস্তা—নানাবিধ পাখী। বাজ্ড়ি, ময়না, তিলোরা, লাল, ময়তাবি, মুনিয়া, দহিয়াল, কোকিল, জরদপিলক—পাখীর হাট। সারেঙ্গী যেই বাজনা শুরু করে, পাখীর দল তখন আর এক পর্দা উচ্চে শিস দিতে থাকে। পাখীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া মানুষ পর্দা চড়াইতে পারে না। হাসীনা বাইজী একটু হাসিয়া নিবেদন করিল যে, পাখীদের না সরাইলে সে গান গাহিতে পারিবে না। উগ্রমোহন সিংহ জবাব দিলেন, পাখী তো এখন সরানো সম্ভব নয়। হাসীনা বিবি যদি গান গাহিতে অসমর্থা হন, তাহা হইলে তাহার

জন্য দায়ী পাখীও নহে, বিবি সাহেবাও নহেন। দায়ী আমাদের দুরদৃষ্ট।

হাসিনা বিবি আরও দুই-একবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গান জমিল না। কোকিল, দোহিয়াল, কাকাতুয়া, ময়না আসর জমাইয়া রাখিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, আজ থাক্ তা হ'লে। কাল পাখীগুলো সরিয়ে রেখো উগ্রমোহন। পাখী সরিয়ে মহিষগুলো এনে হাজির ক'রো না যেন আবার।

উগ্রমোহন বলিলেন, আমরা ক্ষেপেছি, এই যথেষ্ট চিন্তার কারণ। মহিষগুলোকে সুদ্ধ ক্ষেপিয়ে লাভ হবে না, তা তো বুঝছি।

গান হইল না। চন্দ্রকান্তকে জব্দ করিয়াছেন ভাবিয়া উগ্রমোহন কিন্তু ভারি সন্তুষ্ট হইলেন।

কন্যা-সম্প্রদান করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ নিজ শয়নগৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিনের উপবাসে দেহ-মন ক্লান্ত।

কমলার মুখখানা তাঁহার বারংবার মনে পড়িতেছে। সে বাঁচিয়া থাকিলে এই বিবাহ হইত কি? রুম্নি-ঝুম্নির বয়স এই তো সবে নয় বৎসর। গঙ্গাগোবিন্দ ভাবিতেছিলেন, ইহারই মধ্যে রুম্নি-ঝুম্নিকে পর করিয়া দিলাম। এত তাড়াতাড়ি বিবাহ দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না তো! সমান্য একটা স্বপ্ন দেখিয়া এই দুর্বলতা প্রকাশ না করিলেই পারিতাম। রাণী বহ্নিকুমারী আমার কে?

রাত্রি পোহাইতেছে। পূর্বাকাশে উষাভাস দেখা যাইতেছে। ক্লান্ত গঙ্গাগোবিন্দ চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিলেন।

ঠিক সেই সময় রাণী বহ্নিকুমারীও একাকিনী অলিন্দে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই বিরাট উৎসবে তিনিও যোগ দিয়াছিলেন,—কিন্তু অন্তরের সহিত নয়, লৌকিকতার খাতিরে। তাঁহার অন্তরে যাহা হইতেছিল, তাহা এতই বিচিত্র ও জটিল, এতই মধুর ও তিক্ত যে, তাহা বর্ণনাসাপেক্ষ নহে। বহ্নিকুমারী দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের উদ্যান-মধ্যবর্তী দীর্ঘিকার কালো জলে এক জোড়া রাজহংস ভাসিতেছে। এই হংসদম্পতিকে দেখিয়া তাঁহার হিংসা হইতেছিল। নির্নিমেষনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব মানুষ এবং মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম এই ধনীরা।

নহবৎখানায় সানাই তখন ভৈরবী ধরিয়াছে।

২০

বিরাট উৎসবের পর বিরাট অবসাদ আসে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত উভয়েরই মন অবসন্ন। ইহার আরও একটা কারণ ছিল। যদিও উগ্রমোহনের জিদই বজায় থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই জয়লাভের মধ্যে যে চন্দ্রকান্তের অনুগ্রহবর্ষণ আছে—এ কথা উগ্রমোহন কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা নিঃশব্দে বলিয়া উঠিতেছিল, চন্দ্রকান্ত ছেলে দুইটিকে ফিরাইয়া না দিলে এ

বিবাহ হইত কি না সন্দেহ। অন্তরাত্মার এই উক্তি উগ্রমোহনের পক্ষে সুখকর নহে।

চন্দ্রকান্তের মনে সুখ ছিল না। তাহার কারণ গোলোক সা। সা-জীর কোন সন্ধানই তিনি পাইতেছেন না। কমলাক্ষবাবু জমিদারির সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া এই কর্মেই নিযুক্ত আছেন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন খবরই তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ গোলোক সাকে মুক্ত করিতে চন্দ্রকান্ত ধর্মত বাধ্য। তাঁহারই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া গোলোক সাহা তাঁহাকে টাকা দিয়া বিপন্ন হইয়াছে। যেমন করিয়া হউক, লোকটাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত যথারীতি দাবার ছক লইয়া বসিয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলা চলিতেছে। এমন সময় চন্দ্রকান্তের বাড়ির সম্মুখস্থ পথ দিয়া বাজনা বাজাইয়া একদল লোক যাইতেছে শোনা গেল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাজনা কিসের?

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিল।

দেখে আয় তো, কিসের বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে!

ভজনা চলিয়া গেল। উভয়ে আবার দাবার ছকে মন দিলেন।

একটি বড়ে আগাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এইবার তোমার হয় গজ, না হয় নৌকো—একটা যাবেই।

আচ্ছা, এই নাও। তোমার মন্ত্রীকে সামলাও।

আবার দুইজনে নীরব। ভজনা আসিয়া খবর দিল যে, আনন্দপুরের দোল-পূর্ণিমার মেলায় একদল বাজিকর যাইতেছে, তাহাদেরই বাদ্যভাণ্ড।

উগ্রমোহন বলিলেন, আনন্দপুরে মেলা বসেছে নাকি? গেলে মন্দ হ'ত না।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এইবার তোমার মন্ত্রীটি বাঁচাও দেখি।

মুমূর্ষু মন্ত্রীকে উগ্রমোহন একটি ঘোড়া দিয়া বাঁচাইলেন। ঘোড়াটি অবশ্য তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

চন্দ্রকান্ত আবার হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিলে তিনি আদেশ দিলেন, আসব নিয়ে আয় তো। আজ শীতটা একটু বেশি অন্য দিনের চেয়ে।

দুইটি সুদৃশ্য স্ফটিকাধারে করিয়া ভজনা আসব আনিয়া দিল। দুইজনে নিঃশব্দে তাহা পান করিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

খেলা শেষ করিয়া উগ্রমোহন যখন গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন, তখন শুক্লা-একাদশীর চন্দ্র মধ্যগগনে উঠিয়াছে।

উগ্রমোহন চলিয়া গেলে কমলাক্ষবাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে কিছু?

কমলাক্ষবাবু কহিলেন, এইটুকু শুধু নিট খবর পেয়েছি যে, গোলোক সা যম-জঙ্গলে কোথাও নেই।

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, এসব খবর তুমি সংগ্রহ করছ কি উপায়ে?

প্রশ্ন শুনিয়া কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকান্ত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উপায়টা কি তোমার?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কমলাক্ষবাবু বলিলেন, আমাদের সিপাহী পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি।

এসব খবর ঠিকমত নেওয়া ওসব ভোজপুরী সিপাহীর কর্ম নয়। দাঙ্গা করতেই ওরা মজবুত, এসব সূক্ষ্ম ব্যাপার ওদের দ্বারা হবে না। তুমি এক কাজ কর, মানিক মণ্ডলকে লাগাও।

কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়াল-চাহনি চাহিতে লাগিলেন। চন্দ্রকান্ত বলিয়া চলিলেন, লোকটা খুব কাজের। আমার বিশ্বাস, কিছু টাকা ঢাললেই রাজী হয়ে যাবে। বুঝলে?

কমলাক্ষবাবু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন, কার্পণ্য ক'রো না এসব ব্যাপারে। টাকা ঢাল, ঠিক হয়ে যাবে। মানিক মণ্ডলের কাছে লোক পাঠাও আজ। আমি হয়তো দু-এক দিনের জন্যে বেরুতে পারি, আনন্দপুরের মেলায় যাবার ইচ্ছে আছে, ইতিমধ্যে গোলোক সার খবরটা যোগাড় ক'রো।

কমলাক্ষবাবু চলিয়া গেলে তিনি সেতারটা পাড়িয়া বসিলেন এবং মীর সাহেবের কাছে হিন্দোলের যে গৎটা শিখিয়াছিলেন তাহা বাজাইতে লাগিলেন।

পরদিন লোক-লস্কর বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে জমিদার উগ্রমোহন সিংহ আনন্দপুর মেলা অভিমুখে রওনা হইলেন দেখা গেল। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহের পর জীবনটা তাঁহার নিতান্তই একঘেয়ে ঠেকিতেছিল। আনন্দপুর মেলায় কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধানে তিনি যাত্রা করিলেন।

দশ ক্রোশ দূরবর্তী আনন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমার সময় একটি প্রকাণ্ড মেলা হয়। আনন্দপুর উগ্রমোহনের বা চন্দ্রকান্তের জমিদারির অন্তর্গত নহে। ক্ষুদ্র জমিদার রামপ্রতাপ চৌবের ইহা জমিদারি। মেলাটি বেশ বড় মেলা। বহু স্থান হইতে লোকজন দোকানী ব্যবসায়ী এই মেলায় আসিয়া থাকে। অনেক গণ্যমান্য ধনী জমিদারও এই মেলায় পদার্পণ করেন। গরু, ঘোড়া, পাখী পর্যন্ত এই আনন্দপুর মেলায় বিক্রয় হয়—এত বড় এই মেলা। উগ্রমোহনের পশু-পক্ষী কেনার শখ খুব বেশি, তাই প্রতি বৎসর তাঁহার এই মেলায় যাওয়াটা একটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। সুতরাং উগ্রমোহনের পালকি পরদিন আনন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

চন্দ্রকান্ত বাতায়ন পথে দেখিলেন, উগ্রমোহনের পালকি চলিয়া গেল। তিনিও পালকি-যোগে একটু পরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অবশ্য লোকজন বিশেষ কিছু গেল না। আটজন পালকির বেহারা এবং একটি ক্ষুদ্র পেঁটরা তাঁহার সঙ্গী হইল।

২১

আনন্দপুর মেলায় উগ্রমোহন সিংহের তাঁবু পড়িয়াছে। উগ্রমোহন পৌঁছিবার কিছু পরেই চন্দ্রকান্তের পালকিও আনন্দপুরে পৌঁছিল। নিজের আগমন উগ্রমোহনকে জানাইবার ইচ্ছা চন্দ্রকান্তের ছিল না। সুতরাং প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষতলে পালকিটা তিনি নামাইতে বলিলেন। পালকি হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রকান্ত বেহারাদের বিদায় দিলেন। বলিলেন, তোরাও মেলা দেখ্ গিয়ে, যা।—বলিয়া প্রত্যেক বেহারাকে কিছু অর্থ দিলেন। বেহারাগণ আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম করিল এবং খুশী হইয়া মেলার জনতার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহারা চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত আবার পালকির ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটু পরে পুনরায় যখন তিনি পালকি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে চেনা শক্ত। সামান্য একজোড়া গোঁফ এবং একটি রঙিন চশমার সহায়তায় চন্দ্রকান্ত একেবারে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছেন।

ছদ্মবেশ ধারণ করা চন্দ্রকান্ত রায়ের একটি গোপন শখ। এ বিষয়ে বহু পুস্তক তিনি পড়িয়াছেন এবং বহু অর্থ তিনি ব্যয় করিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত জীবন-রসের রসিক। তিনি ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এক বেশে জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করা যায় না। জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র প্রাণবস্তুর সম্যক পরিচয় লাভ করিতে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় একা অপারগ। জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় জমিদার-মহলেই

স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন এবং অভিজাতসম্প্রদায়সুলভ খানিকটা আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ের পক্ষে বেদের তাঁবুতে গিয়া ফুলকির নৃত্যলীলা দর্শন করা সম্ভব নয়। মানব-সমাজের নানা বিভাগ। এক বিভাগের আচারব্যবহার পোশাকপরিচ্ছদ অন্য বিভাগে অচল। সুতরাং সর্ব-বিভাগের রসাস্বাদন করিতে হইলে ছদ্মবেশ প্রয়োজন। বৈচিত্র্য পাইতে হইলে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ের স্বরূপত্ব মাঝে মাঝে লোপ করিয়া দেওয়া দরকার। গভীর নিশীথে চন্দ্রকান্ত রায় কতবার কত বেশে কত স্থানে গিয়াছেন! এই সেদিনই তো নিজেরই একটা জলকরে ধীবরের বেশে জেলে-ডিঙিতে মাছ ধরিয়া তিনি রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

আজও তাঁহার শখ হইয়াছে—ছদ্মবেশে মেলাটা দেখিবেন। সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। নিকটেই দেখিলেন মেলার জমিদার রামপ্রতাপ চৌবের তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর মধ্যে নৃত্য-গীতের আয়োজন। চন্দ্রকান্ত সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন।

উগ্রমোহনও মেলায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মেলার যে অংশে ঘোড়া বিক্রয় হইতেছিল, উগ্রমোহন সেই দিকে গেলেন। একটি ঘোড়া দেখিয়া তাঁহার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। কালো কুচকুচে ঘোড়াটি, পায়ের চারটি খুর সাদা, কপালে সাদা তিলক, রেশমের মত

কোঁকড়ানো ঘাড়ের চুলগুলি। অশ্ব ঘাড় বাঁকাইয়া আছে। সুন্দর সুলক্ষণ ঘোড়া। উগ্রমোহনের কিনিবার শখ হইল। তিনি তাঁবুতে ফিরিয়া অক্ষয় গোমস্তাকে দরদস্তুর করিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। অশ্বটি অধিকার করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত হৃদয় প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। ক্রীড়নকলুব্ধ বালকের ন্যায় উগ্রমোহন সিংহ নিজে তাঁবুতে অক্ষয়ের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই অক্ষয় ফিরিল এবং কহিল, ঘোড়া তো হুজুর আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।

তাই নাকি ? কে কিনেছে ?

রামপ্রতাপবাবু।

ও।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উগ্রমোহন সিংহ বলিলেন, আচ্ছা, তুমি রামপ্রতাপবাবুর কাছেই যাও। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে বল যে, ঘোড়াটি আমার ভারি পছন্দ হয়েছে, তিনি যদি ঘোড়াটি আমাকে বিক্রি করেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। তিনি যে দামে কিনেছেন, তার চেয়ে দাম আমি বেশি দিতেও রাজী আছি। সঙ্গে টাকা কত আছে ?

অক্ষয় সংক্ষেপে কহিল, টাকা আছে। শুনলাম তিন শো পঁচিশ টাকায়—

আচ্ছা, তুমি যাও, গিয়ে বলগে যে, আমি পাঁচ শো পর্যন্ত দিতে রাজী আছি। ঘোড়াটা আমার চাই।

অক্ষয় চলিয়া গেল। অবুঝ বালকের মনোবৃত্তি লইয়া

উগ্রমোহন নিজ তাঁবুতে বসিয়া অধীরভাবে গুম্ফপ্রান্তে চাড়া দিতে লাগিলেন।

রামপ্রতাপ চৌবে তরুণবয়স্ক জমিদার। মেলায় একটু স্ফূর্তি করিতে আসিয়াছেন। তিনি উগ্রমোহনের মত ঘোড়ার সমঝদার নহেন; কেবল বাজারের সেরা ঘোড়াটা দেখিয়া কিনিয়া ফেলিয়াছেন মাত্র। ঘোড়ার অপেক্ষা তাঁহার বাইজীর শখই বেশি। দুইজন সুন্দরী বাইজী ইতিমধ্যে আসিয়া তাঁহার তাঁবুতে আসরও জমাইয়াছে। ছদ্মবেশী চন্দ্রকান্ত রামপ্রতাপ চৌবের মোসাহেব সাজিয়া বাঁয়া-তবলা লইয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। রামপ্রতাপ চৌবে যদি ঘুণাক্ষরেও চন্দ্রকান্তের আসল পরিচয় জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে অবশ্য এ রস আর জমিত না। এ অঞ্চলের ছোট বড় সকল জমিদারই চন্দ্রকান্তকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। শ্রদ্ধাস্পদকে লইয়া আর যাই হোক, বাইজীর আসর জমে না। চন্দ্রকান্ত মতিলাল নামে নিজের পরিচয় দিয়া বেমালুমভাবে দলে ভিড়িয়া গিয়াছেন এবং আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন।

অক্ষয় যখন আসিয়া হাজির হইল, তখন চৌবেজীর বেশ একটু রসাবিষ্ট ভাব। সিদ্ধির নেশাটি ধরিয়াছে, সম্মুখে সুন্দরী বাইজী গাহিতেছে—

উমড় ঘুমড় ঘন গরজে
মেরো পিয়া পরদেশ—

গান থামিতে অক্ষয় উগ্রমোহনের প্রস্তাব চৌবেজীকে নিবেদন করিল। চৌবেজী প্রথমটা বুঝিতেই পারেন না। ঘোড়া কেনার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, ও, উগ্রমোহনবাবু ঘোড়া নেবেন? বেশ তো।

চকিতের মধ্যে চন্দ্রকান্ত দেখিলেন, একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; তিনি চৌবেজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দিয়ে দিন ঘোড়া। কিন্তু উগ্রমোহনবাবু দাম দিতে চাইছেন, এইটে আমার ভাল লাগছে না। সামান্য একটা ঘোড়ার দাম নেওয়াটা কি হুজুরের ইজ্জতের পক্ষে ক্ষতিকর নয়? ঘোড়া আপনি দিয়ে দিন, দাম নেবেন না।

সিদ্ধির ঝোঁকে চৌবেজী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, দাম নেব না।

ছদ্মবেশী চন্দ্রকান্ত তখন অক্ষয়ের দিকে ফিরিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন, বাবু সাহেব বলিতেছেন যে, তিনি ঘোড়াটিকে বিক্রয় করিবেন না। তবে সিংহ মহাশয়ের যদি এই সামান্য অশ্বটিকে পছন্দ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সানন্দে ইহা তাঁহাকে দান করিতে প্রস্তুত আছেন।

অক্ষয় এই বার্তা লইয়া ফিরিয়া গেল।

উগ্রমোহন অধীরভাবে পায়চারি করিতেছিলেন।

অক্ষয় গিয়া চৌবেজীর বার্তা নিবেদন করিতেই বারুদের স্তূপে যেন আগুন পড়িল। উগ্রমোহন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি বললে? দান? অর্বাচীনটার স্পর্ধা কম নয় তো!

একটা চুনো-পুঁটি পত্তনিদার, তার এত বড় লম্বা কথা! সাড়ে পাঁচ শো টাকা আন। আর হরনন্দন সিপাহীকে ডেকে দাও।

অক্ষয় একটি থলি করিয়া সাড়ে পাঁচ শত টাকা আনিয়া প্রভুর হাতে দিল। হরনন্দন সিপাহী আসিলে উগ্রমোহন বলিলেন, তুম লোগ কয় আদ্‌মি হো?

পঁচিশ।

মারপিট করনেকো লিয়ে তৈয়ার রহো। ঔর দো সিপাহী হামরা সাথ চলো।

দুইজন সিপাহী সমভিব্যাহারে উগ্রমোহন সিংহ শঙ্কর-মাছের হাণ্টারগাছটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চৌবেজীর তখন বেশ তন্ময় ভাব। সম্মুখে নৃত্যপরা বাইজী। মতিলাল ওরফে চন্দ্রকান্ত সঙ্গত করিয়া চলিয়াছেন। তবলা সারেং নূপুরের ঐক্যতানে অপূর্ব রসলোক সৃষ্ট হইয়াছে। এমন সময় মূর্তিমান রস-ভঙ্গের মত উগ্রমোহন আসিয়া উপস্থিত। তিনি সোজা চৌবেজীর কাছে গিয়া সপাসপ ঘা কয়েক চাবুক বসাইয়া দিয়া বলিলেন, উগ্রমোহন সিং কারও দান নেয় না কখনও। মানীর মান রেখে কথা বলতে শিখুন। টাকার তোড়াটা ঝনাৎ করিয়া আসরে ফেলিয়া দিয়া বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন, ঘোড়া নিয়ে চললাম। সাধ্য থাকে আটকান।

হাল্লা হৈ-হৈ মারামারির মধ্যে সেই রাত্রেই উগ্রমোহন অশ্বপৃষ্ঠে মেলা ত্যাগ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ও আসিয়া পাল্কিতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মুখে একটি মৃদু হাস্যরেখা। এত সহজে কার্যসিদ্ধি হইবে তিনি ভাবেন নাই। গোলোক সাকে উদ্ধার করিতে হইলে উগ্রমোহনকে অন্য কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত করিয়া অন্যমনস্ক রাখা দরকার। গতকল্য হইতে চন্দ্রকান্ত চিন্তা করিতেছিলেন, কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে! উগ্রমোহন একটু অন্যমনস্ক না থাকিলে গোলোক সার অনুসন্ধান করা অসম্ভব, অন্তত কমলাক্ষ তাহাই বলিতেছে।

মতিলাল-বেশে আন্দাজে যে দাবার চালটা তিনি চালিয়াছিলেন, তাহা অব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

২২

উক্ত ঘটনার প্রায় পনেরো দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় অঘোর চক্রবর্তী আসিয়া উগ্রমোহনকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন।

উগ্রমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল?

অঘোরবাবু শান্তভাবে উত্তর দিলেন, মকদ্দমা ডিসমিস হয়ে গেল।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যাক। ঘোড়াটা চড়ার শখও মিটে গেছে আমার। এবার ওটা চৌবেজীকে ফেরত দিয়ে দাও।

যে আজ্ঞে।

থাম, একটা চিঠিও আমি দিয়ে দেব ওর সঙ্গে।—বলিয়া উগ্রমোহনবাবু নিজে খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন। অঘোরবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া নীরবে তামাটে গোঁফ জোড়াটাকে দক্ষিণ করতল দিয়া অকারণে মুছিতে লাগিলেন। যখনই অঘোরবাবু এরূপ করেন তখনই বুঝিতে হইবে, অঘোরবাবু মনে মনে কোন কিছু চিন্তা করিতেছেন। অঘোরবাবুর পরিচ্ছদও আজ একটু অসাধারণ ধরনের। অঙ্গে একটি কালো চাপকান-গোছের লম্বা কোট, গলায় পাকানো সাদা চাদর এবং মাথায় পাগড়ি-জাতীয় শিরস্ত্রাণ। তিনি সদর হইতে ফিরিয়াছেন; আনন্দপুর মেলায় যে দাঙ্গা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে মকদ্দমার তদ্বির করিতে তিনি জিলা-কোর্টে গিয়াছিলেন। এত বড় একটা মকদ্দমা কি উপায়ে যে সহসা ডিসমিস হইয়া গেল, তাহা অঘোরবাবুই জানেন।

উগ্রমোহন সিংহ ঘরে বসিয়া পত্র লিখিলেন—

প্রিয় চৌবেজী,

আমার শখ মিটিয়াছে। এইবার আপনার শখ মিটাইতে পারেন। ঘোড়াটি ফেরত পাঠাইতেছি। মামলা করিয়া কোন সুবিধা হইবে না, তাহা আশা করি বুঝিয়াছেন।

উগ্রমোহন সিংহ

বাহিরে আসিয়া পত্রখানি অঘোরবাবুর হস্তে দিয়া তিনি বলিলেন, এই চিঠির সঙ্গে ঘোড়াটা পাঠিয়ে দাও।

যে আজ্ঞে।—বলিয়া অঘোরবাবু পত্রখানি লইলেন।

তাহার পর তিনি বলিলেন, সদরে গিয়ে শুনলাম, শ্যামাঙ্গিনী-দাতব্য-চিকিৎসালয় হচ্ছে। রাণীমার নাম ক'রে সেখানে হাজার খানেক টাকা দান ক'রে এসেছি।

শ্যামাঙ্গিনী কে?

শ্যামাঙ্গিনী দেবী হচ্ছেন বর্তমান সদরালার স্ত্রী। অতি সদাশয় মহিলা ছিলেন তিনি। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্যে চিকিৎসালয় হচ্ছে শুনলাম। অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডলে ক্ষণিকের জন্য একটু হাসির আভাস যেন জাগিয়া মিলাইয়া গেল।

উগ্রমোহন বলিলেন, বেশ করেছ।

তাহার পর অঘোরবাবু বলিলেন, গোলোক সা সম্বন্ধে একটা কোন ব্যবস্থা করা দরকার। তাকে এ রকম ভাবে লুকিয়ে আর কতদিন রাখা যাবে?

কোথায় আছে এখন?

কালীর মন্দিরে, চামা-মাঠে।

উগ্রমোহন খানিকক্ষণ ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, আচ্ছা, আগামী কালীপূজার দিন আমি রাত্রে সেখানে যাব। মায়ের পূজার ভাল ক'রে আয়োজন ক'রো।

যে আজ্ঞে।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলোক সার ব্যাপারে একদল নিরীহ বেদে-বেদেনী যে ধরা পড়েছিল শুনেছিলাম, তাদের কোন ব্যবস্থা করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তারা ছাড়া পেয়ে গেছে। আমাদের সদর নায়েব কুঞ্জবাবু সে বন্দোবস্ত ক'রে এসেছেন।

তাদের কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রত্যেককে দশ টাকা ক'রে নগদ আর একখানা ক'রে কাপড় দেওয়ার হুকুম দিয়েছি।

কি ক'রে ব্যবস্থা হ'ল ?

তারা ছাড়া পাবার পর শিয়ালমারি কাছারিতে তাদের নাচগান করবার জন্যে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ম্যানেজারের এতাদৃশ দূরদর্শিতায় উগ্রমোহন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সবাই সব পেলে, তুমিই কিছু পেলে না !

অঘোরবাবুর পাষাণ-মুখচ্ছবি কোন ভাব প্রকাশ করিল না। কেবল কহিলেন, আপনার অনুগ্রহই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

উগ্রমোহন বলিলেন, আচ্ছা, এখন তা হ'লে যাও। আগামী কালীপূজার দিন গোলোক সার ব্যবস্থা ক'রে ফেলা যাবে।

অঘোরবাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অঘোরবাবু চলিয়া যাইতেই উগ্রমোহনের মনে হইল, ওদিকের জানালাটার দিক হইতে ঝপ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। উগ্রমোহন বলিলেন, কে ?—বলিয়া জানালার দিকে আগাইয়া গেলেন। মনে হইল, অন্ধকারে কে যেন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। আবার তিনি ডাকিলেন, এই, কে ?

আজ্ঞে, আমি।—বলিয়া মূর্তিটি ফিরিয়া আসিয়া নমস্কার করিল।

মানিক মণ্ডল যে ! ওখানে কি করছিলে তুমি ?

আজ্ঞে, সিকি আমার একটা প'ড়ে গিয়েছিল হুজুর, তাই খুঁজছিলাম।

সিকি ? ওখানে হঠাৎ সিকি গেল কি ক'রে ?

বেলতলাটায় একটা বেল পড়ল কিনা, তাই কুড়োতে গিয়ে সিকিটা গেল প'ড়ে।

তাই নাকি ?

হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো, হুম্‌বো।—চন্দ্রকান্তের পালকি আসিল। উগ্রমোহন সেই দিকে আগাইয়া গেলেন। মানিক মণ্ডল পলাইয়া বাঁচিল।

তাহার পরদিন অঘোরবাবু আসিয়া আবার প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সংবাদ এই যে, শ্রীযুক্ত রামপ্রতাপ চৌবের নিকট যে সিপাহী অশ্বটি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে চৌবেজী অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছেন এবং ঘোড়াটাকেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহাই তিনি জানিতে আসিয়াছেন। অঘোরবাবু ইহাও বলিলেন, কথাটা শুনলাম ব'লে হুজুরকে জানিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশি আর ঘাঁটাঘাঁটি করা আমাদের পক্ষে সম্মানজনক হবে না। সিপাহীটা কিন্তু বড় মর্মাহত হয়েছে।

উগ্রমোহনবাবু সংক্ষেপে আদেশ দিলেন, সিপাহীটাকে এখনই দূর ক'রে দাও। বুঝলে ?

অঘোরবাবু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। উগ্রমোহন সিংহ আবার বলিলেন, যে সিপাহী অপমানিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার

করে না, বাড়িতে ফিরে এসে মর্মাহত হয়, তাকে এখনই বিদেয় কর। ও-রকম পিষ্ট সিপাহী রাখতে চাই না আমি। চৌবেজীকে আর একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। দুধনাথ পাঁড়ের মারফৎ এটা পাঠিও। সে হাজত থেকে খালাস হয়ে এসেছে তো? সে যেন হাতিয়ারবন্দ্ হয়ে যায়।—বলিয়া উগ্রমোহ খাস-কামরায় চিঠি লিখিতে চলিয়া গেলেন। অঘোরবাবু নীরবে দাঁড়াইয়া গোঁফের উপর অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

উগ্রমোহন লিখিলেন—

চৌবেজী,

আপনার রামপ্রতাপ নাম সার্থক। সত্যই রামের ন্যায় প্রতাপ আপনার। আপনার বীরত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। কথিত আছে, আপনার প্রপিতামহ স্বর্গীয় প্রিয়প্রতাপ চৌবে মহাশয় সুন্দরবন অঞ্চলে বন্য ব্যাঘ্র শিকার করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আপনি বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। আমার সিপাহীর প্রতি আপনার বিনম্র ব্যবহারের কথা শুনিয়া দুধনাথ পাঁড়েকে এই পত্রের বাহক-স্বরূপ পাঠাইতেছি। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এই ব্যক্তি একদা একখানি হস্ত বিসর্জন দিয়াছিল। মস্তক বিসর্জন দিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু আত্মসম্মান সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। আশা করি, আপনি সুস্থ হইয়াছেন।

শ্রীউগ্রমোহন সিংহ

কিছুক্ষণ পরে তুধনাথ পাঁড়ে পত্রের জবাব লইয়া আসিল। রামপ্রতাপ চৌবে লিখিয়াছেন—

সিংহ মহাশয়,

এই সামান্য ব্যাপার লইয়া নাড়াচাড়া করিতে আর প্রবৃত্তি নাই। ক্ষেত্রান্তরে আপনার দর্শন লাভের আশায় রহিলাম।

শ্রীরামপ্রতাপ চৌবে

২৩

রাণী বহ্নিকুমারী একাকিনী বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কোলের উপর 'মালবিকাগ্নিমিত্র'খানি খোলা পড়িয়া ছিল। তিনি মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ-ব্যাপারে তাঁহার মনের মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। প্রমাণ চাহিলে অবশ্য তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু অন্তরের মধ্যে তিনি নিঃসংশয়ে ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারই প্রীত্যর্থ গঙ্গাগোবিন্দ রুম্‌নি-ঝুম্‌নির সহিত অজয়-বিজয়ের বিবাহ দিয়াছেন।

কথাটা বুঝিয়া অবধি তাঁহার মনে শান্তি নাই। কেন তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে ও-কথা বলিতে গিয়াছিলেন? গঙ্গাগোবিন্দ হয়তো ভাবিয়াছিলেন, স্বামীর হইয়া তিনি ওকালতি করিতেছেন এবং এইজন্যই তিনি হয়তো এই মহানুভবতাটা করিয়া বসিলেন। মনে করিলেন, রাণী ইহাতে খুশী হইবেন। হায় রে, রমণীরা সত্যই কিসে খুশী হয়, তাহা যদি পুরুষেরা

বুঝিত। গঙ্গাগোবিন্দ কি জানেন না যে, তাঁহার খুশীর পথে তিনি নিজেই একদিন অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন? দারিদ্র্যের দম্ভ। এই দম্ভের জগদ্দল প্রস্তরের তলায় বাণীর কিশোরী মন যে একদিন তিনি নিজেই গুঁড়া করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি নিজে জানেন না? আজ তিনি মহানুভবতা দেখাইয়া বাণীকে খুশী করিতে চান? স্পর্ধা তো তাঁহার কম নয়! তিনি কি মনে করেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে পান নাই বলিয়া বাণী আজও তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন? তাহা যদি মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মূর্খ তিনি। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার উগ্রমোহন সিংহের রাণী বহ্নিকুমারী কিশোরী-কালের একটা ভ্রমকে আঁকড়াইয়া আজও বসিয়া নাই। উগ্রমোহন সিংহের যিনি পত্নী, তাঁহার আবার ক্ষোভ কিসের? গঙ্গাগোবিন্দের মত পুঁথির মুখস্থ বুলি আওড়াইতে হয়তো তাঁহার স্বামী পারেন না, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মত পুরুষসিংহ কয়টা আছে এ অঞ্চলে? কয়টা লোকের এমন বিরাট হৃদয়, বিশাল শৌর্য, বিপুল বিক্রম? গঙ্গাগোবিন্দ এই বিবাহ-ব্যাপারে মহত্ত্বটা দেখাইয়া ভালই করিয়াছেন; তাহা না হইলে উগ্রমোহনের রোষবহ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেন তিনি। অন্তঃসারশূন্য দারিদ্র্যের গর্ব লইয়াই লোকটি গেলেন। এত বড় অহঙ্কৃত লোক বহ্নিকুমারী জীবনে আর একটাও দেখেন নাই। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহটাও তিনি দিলেন শুধু একটা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য।

কি আর এমন তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাকে? কিছুই নয়। এ স্পর্ধা। এ কেবল তাঁহাকে খাটো করিয়া দিবার একটা ফন্দি। গঙ্গাগোবিন্দকে আর কেহ না চিনুক, বাণী ভাল করিয়াই চেনেন। বাণী ভাল করিয়াই জানেন যে, গঙ্গাগোবিন্দের জীবনের প্রধান সুর—'কাহারও নিকট খাটো হইব না, চিরকাল মাথা উঁচু করিয়া থাকিব। কাহারও নিকট অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিব না, যতটা পারি অপরকে অনুগ্রহ করিব।' বাণীকে অনুগ্রহ করিয়া তিনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহে মত দিয়াছেন। তাঁহার এই নীরব অহঙ্কারে বহ্নিকুমারীর সমস্ত হৃদয়টা যেন জ্বালা করিতে লাগিল। কেহ যদি তাঁহার উঁচু মাথাটা জোর করিয়া হেঁট করিয়া দিতে পারে, তবে যেন তিনি স্বস্তি পান।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' আর পড়া হইল না, তাঁহার সমস্ত হৃদয় গঙ্গাগোবিন্দকে লইয়া অকারণে তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি জোর করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন যে, গঙ্গা-গোবিন্দের সমস্ত আচরণের মধ্যেই আত্মশ্লাঘা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা আর কেহ বুঝিতে না পারুক, তিনি বুঝিয়াছেন। তিনি জোর করিয়াই বারংবার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার স্বামীর তুলনায় গঙ্গাগোবিন্দ একটা নগণ্য জীব—অত্যন্ত আত্মপরায়ণ, অত্যন্ত স্বার্থপর এবং অত্যন্ত অহঙ্কারী। সমস্ত পুরুষ-জাতিটাই এইরূপ। কেবল স্থান-কাল-পাত্রভেদে একটু ইতরবিশেষ। মহাকবি কালিদাস এই 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের রাজার মুখ দিয়া মালবিকার

যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পুরুষ-কবির পক্ষেই সম্ভব—প্রেমের ছদ্মবেশে লালসার উচ্ছ্বাস। বহ্নিকুমারী মুক্ত বাতায়ন-পথে চাহিয়া একাকিনী বসিয়া রহিলেন। এক ঝলক বাতাস চূতমুজুলের গন্ধ বাহিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু বহ্নি-কুমারীর তাহাতে আজ আনন্দ হইল না। গঙ্গাগোবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সমস্ত মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এত বিষের মধ্যেও কি অমৃত ছিল না? ছিল। বায়ুমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত আছি বলিয়া আমরা যেমন বায়ুব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, অমৃতপরিমণ্ডলে নিমজ্জিত বহ্নিকুমারীর অন্তরাত্মা অমৃত সম্বন্ধে তেমনই সচেতন ছিল না। সচেতন হইল, যখন উগ্রমোহন আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, গঙ্গাগোবিন্দ দেশ ছেড়ে একেবারে চলল।

কোথায়?

কাশী।

কেন?

সংস্কৃত পড়বে ব'লে। তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। ছোকরার চিরকালই মাথার একটু ছিট আছে। বলিয়া একখানি পত্র তিনি বহ্নিকুমারীকে দিলেন। তাহাতে লেখা আছে—

বাণী,

তোমাদের কৃপায় আমার জীবনের সামাজিক দায়িত্ব শেষ হইয়াছে। যে কয়দিন বাঁচিব, লেখাপড়ার চর্চা করিয়াই

কাটাইব স্থির করিয়াছি। বহুদিন হইতে বাসনা, ভাল করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। দারিদ্র্যনিবন্ধন এতদিন তাহা পারি নাই। সম্প্রতি কাশী হইতে জনৈক অধ্যাপক আশ্বাস দিয়াছেন যে, আমি যদি তাঁহার নিকট গিয়া বাস করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করিবেন। এ সুযোগ আমি পরিত্যাগ করিব না। দুই-একদিনের মধ্যেই কাশী যাত্রা করিব এবং জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা বিশ্বেশ্বরের চরণতলে কাটাইয়া দিব। যাইবার পূর্বে তোমার সাক্ষাৎ পাইলে সুখী হইতাম। ইতি

গঙ্গাগোবিন্দ

বাণী বহ্নিকুমারীর সমস্ত অন্তরটা কে যেন মুচড়াইয়া দিল। গঙ্গাগোবিন্দ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন? আর কখনও ফিরিবেন না? আর কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না তিনি? তাঁহার স্বামী চেষ্টা করিলে কি তাঁহার যাওয়াটা বন্ধ করিতে পারেন না?

বহ্নিকুমারী একটু হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই লোকটা পাগল। এর কাশী যাওয়াটা বন্ধ করতে পার?

অসীম ঔদাসীন্যভরে উগ্রমোহন উত্তর করিলেন, তাতে লাভ কি?

বহ্নিকুমারী মুহূর্তের জন্য উগ্রমোহনের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার পর আবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা বটে।

উগ্রমোহন জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন, হস্তীপৃষ্ঠে

তাঁহার ম্যানেজার অঘোরবাবু আসিতেছেন। আগামী পরশু মহাকালীর মন্দিরে পূজা, তাহার সম্বন্ধেই উপদেশ লইতে আসিতেছেন বোধ হইল।

অঘোর আসছে দেখছি। নীচে যাই।—বলিয়া উগ্রমোহন নামিয়া গেলেন। বহ্নিকুমারী একা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার 'রাজসিংহ' উপন্যাসের জেবউন্নিসা-চরিত্র মনে পড়িল। মবারককে জেবউন্নিসা বিষধর সর্প দিয়া হত্যা করিয়াছিল। তিনিও কি গঙ্গাগোবিন্দকে দেশছাড়া করিলেন? রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ না হইলে তিনি তো চলিয়া যাইতেন না! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বহ্নিকুমারীও জেবউন্নিসার মত ভাবিলেন, যদি চাষার মেয়ে হইতাম!

আবার তখনই তাঁহার মনে হইল, চাষার মেয়ে হইলেই বা করিতাম কি? গঙ্গাগোবিন্দের মত এত বড় একটা অবুঝ লোককে লইয়া কিছুই করা যায় না। নিজের গরিমায় তিনি এমন আত্মমগ্ন যে, অপরের দিকটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার নাই। আলোকের মত দীপ্ত প্রতিভায় তিনি চতুর্দিক শুধু ছড়াইয়া থাকিবেন। কাহারও বিশেষ সম্পত্তি তিনি হইবেন না, কাহারও সুবিধা-অসুবিধা সুখ-দুঃখ তিনি লক্ষ্য করিবেন না। নিজেকে বিকশিত করিয়া বিকীর্ণ করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। বহ্নিকুমারীরই বা তাঁহার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? পৃথিবীতে কাহারও অভাবে কিছু আটকায় না। উগ্রমোহন সিংহের বিশাল জমিদারির মধ্যে গঙ্গাগোবিন্দের মত একটা সামান্য প্রজা থাকিল, কি গেল,

তাহা লইয়া উৎকণ্ঠিত হওয়া রাণী বহ্নিকুমারীর সাজে না। উগ্রমোহনের পত্নী তিনি। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার কে ?

২৪

শ্যামলতালেশহীন রুক্ষ চামা-প্রান্তরে সূর্য অস্ত যাইতেছে। চতুর্দিকে একটা নিষ্করুণ রক্তাভা। রক্তাম্বরধারী কাপালিকের মত চামা-প্রান্তর স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার নীরব উদ্ধত গাম্ভীর্যে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। অনুর্বর তাহার বক্ষে সবুজের চিহ্নমাত্র নাই—বৃক্ষ নাই, গুল্ম নাই, তৃণদলও নাই। ছায়া-বিহীন দীর্ঘ দিবস তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। প্রখর সূর্যের তীব্রদাহে যুগযুগান্ত ধরিয়া চামা-প্রান্তর এইরূপ প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছে। পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার কোমলতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু এক বিশাল ব্যাপ্তি। যতদূর দৃষ্টি যায়, শেষ নাই। ঊষর প্রান্তর আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। মনে হয়, যেন একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষা মূর্তি ধরিয়াছে।

অঘোরবাবু মহাকালীর মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নিমেষ-বিহীন নয়নে সূর্যাস্তের পানে চাহিয়া ছিলেন। চামা-প্রান্তরে অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা মহাকালীর মন্দির তান্ত্রিক-সাধক অঘোর-নাথের অতিশয় প্রিয় স্থান। এই চামা-প্রান্তর যেন তাঁহারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাঁহার ছয় পুত্র আর দুই কন্যার মধ্যে একটিও আজ বাঁচিয়া নাই। শোকে দুঃখে স্ত্রীও মারা গিয়াছেন। অনেকের ধারণা, তান্ত্রিক সাধনাই অঘোরবাবুর কষ্টের কারণ।

যেদিন হইতে তিনি ইহা শুরু করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই মৃত্যুর করাল ছায়া তাঁহার জীবনে পড়িয়াছে। তথাপি তিনি আজিও নিরস্ত হন নাই। তিনি শব-সাধনা করিয়াছেন, নরবলি দিয়াছেন, মহাকালীকে সন্তুষ্ট করিবার বহু চেষ্টা তিনি বহুপ্রকারে করিয়াছেন; কিন্তু ছলনাময়ী উন্মাদিনী তাঁহাকে দিয়াছেন শুধু দুঃসহ শোক। অঘোরবাবুর ধারণা, পাগলী তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন।

তাঁহার দৃঢ় পণ, এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেনই। তাই আজও তিনি একাগ্রমনা শ্যামা-সাধক। এখনও প্রতি অমাবস্যায় এই নির্জন প্রাণহীন শূন্য-প্রান্তরে তিনি মহাকালীর পূজার আয়োজন করেন।

সূর্য অস্ত গেল। অঘোরবাবু নিস্পন্দ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। ঘোর অমাবস্যা-রজনীর গাঢ় তমিস্রা চামা-প্রান্তরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে।

অমাবস্যার গভীর রাত্রি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ অন্ধকার। মহাকালীর মন্দিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। অঘোরনাথ কালীপূজা করিতেছেন। পরিধানে তাঁহার রক্তাম্বর, কপালে সিন্দুরের টীকা, গলায় জবাফুলের মালা। চক্ষু দুইটিও ঈষৎ রক্তবর্ণ, কারণ পান করিয়াছেন। নিকটেই উগ্রমোহন বসিয়া আছেন। তাঁহার সমস্ত মুখে একটা গম্ভীর প্রশান্ত ভাব। তিনি একাগ্রচিত্তে মহাকালীপূজা দেখিতেছেন। পূজা শেষ হইতে আর দেরি নাই।

গোলক সাও একটু দূরে বসিয়া আছে। পূজা হইয়া গেলে তাহার বিচার হইবে। অঘোরবাবু মন্ত্রপাঠ করিয়া চলিয়াছেন, একটা আর্ত ছাগশিশু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। বাহিরে অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার।

পূজা শেষ হইল। বলিদান হইয়া গেল।

উগ্রমোহন তখন গোলোক সার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলবার আছে তোমার? এখন যদি মায়ের সামনে তোমাকে বলিদান হয়, কি করতে পার তুমি?

গোলোক সা কহিল, আমায় ক্ষমা করুন হুজুর।

একবার তো তোমায় ক্ষমা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বার তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ। তোমাকে আর ক্ষমা করা যায় না। তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব আমি, যা তুমি জীবনে কখনও ভুলবে না। দুধনাথ পাঁড়ে!

দুধনাথ পাঁড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঁচিশ চাবুক। পহলে নাঙ্গা কর লেও।

কম্পিত-কলেবর উলঙ্গ গোলোক সাকে লইয়া দুধনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরেই গোলোক সার আর্তস্বর অন্ধকার চামা-প্রান্তরে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

উগ্রমোহন বলিলেন, অঘোর মায়ের প্রসাদ একটু দাও তো। অঘোরবাবু একপাত্র কারণ আগাইয়া দিলেন। উগ্রমোহন তাহা নিঃশেষে পান করিয়া বলিলেন, আর একটু দাও। অঘোরবাবু আর এক পাত্র দিলেন।

গোলোক সাকে লইয়া দুধনাথ পাঁড়ে ফিরিয়া আসিল।

উগ্রমোহন বলিলেন, এখনও শেষ হয় নি। একটু বিশ্রাম করে নাও। আরও চাবুক লাগাব। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আজ চাবকাব তোমায়। তোমার টাকার অত্যন্ত গরম হয়েছে।

উগ্রমোহন আর এক পাত্র কারণ পান করিতে করিতে বলিলেন, তোমার পিঠের চামড়াখানি আজ ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। বুঝলে? আর সেই চামড়ায় এক জোড়া জুতো বানিয়ে তোমার খাত চন্দ্রকান্ত রায়কে উপহার দেব। বুঝতে পারছ?

সহসা গোলোক সার চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। নিকটেই একখানা ইট পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া সে সবেগে উগ্রমোহনের শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। উগ্রমোহন চকিতে মাথা সরাইয়া লইলেন, ইট সোজা গিয়া প্রতিমার অঙ্গে লাগিল। মহাকালীর হস্তধৃত মুণ্ডটা চুরমার হইয়া ভাঙিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ব্যাঘ্রের মতন উগ্রমোহন গোলোক সার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। লাথি, চড়, কিল, জুতা অবিশ্রান্তভাবে বর্ষণ করিয়া শেষে তিনি বলিলেন, এর শাস্তি মৃত্যু! বলিদান দাও একে। অঘোর!

প্রতিমার অঙ্গে আঘাত লাগিয়াছে। ঘোরতর অমঙ্গল আশঙ্কায় অঘোরনাথের অন্তরাত্মা কাঁপিতেছিল। মুখে কিন্তু তাঁহার এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। পুরোহিতের আসন হইতে তিনি ধীরভাবে বলিলেন, বলিদানের পশু অক্ষতদেহ হওয়া

প্রয়োজন। ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। সত্যই গোলোক সার নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি ভিজিয়া গিয়াছিল। উগ্রমোহন প্রচুর কারণ পান করিয়াছিলেন। বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, মায়ের গায়ে আঘাত করেছে। প্রাণ দিয়ে ওকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বলিদান না হয়, অন্য ব্যবস্থা কর। ওর মৃত্যু আমি চাই।

অঘোরবাবু চিন্তা করিয়া বলিলেন, যম-ঘরে পাঠিয়ে দিন তা হ'লে।—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরার তীব্র উন্মাদনায় উগ্রমোহন আবার বলিলেন, হ্যাঁ, এখনই নিয়ে যাও। এই দুধনাথ পাঁড়ে! তুম ঔর শুকুল সিং ঔর—

অঘোরবাবু বলিলেন, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

কিছুক্ষণ পরে অচেতন গোলোক সাকে লইয়া সিপাহীরা যম-জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়া গেল।

সঙ্গে অঘোরবাবুও গেলেন।

মন্দিরের পিছনে মানিক মণ্ডল নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। সেও এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

উগ্রমোহন সিংহ যখন বাড়ি পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি দুইটা হইবে। তিনি গিয়া দেখিলেন, রাখালবাবু দেওয়ান চিন্তিত মুখে তাঁর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

কি খবর হে, এত রাত্রে ?

আজ্ঞে, বৃন্দাবন থেকে প্রাণমোহন এসেছে। কর্তা-মায়ের ভারি অসুখ। আপনাকে যেতে বলেছেন।

মায়ের অসুখ ? কোথা প্রাণমোহন ?

সে তার নিজের বাড়ি গেছে। এখনই ফিরবে।

উগ্রমোহন সিংহের বৃদ্ধা জননী স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার অসুখের খবর শুনিয়া উগ্রমোহন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।—সওয়ারি ঠিক কর। আমি ভোরেই বেরিয়ে যাব। কিছু টাকা আর জন পাঁচেক লোক সঙ্গে চাই।

রাখালবাবু ব্যবস্থা করিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

২৫

উগ্রমোহন বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছেন। বহ্নিকুমারী সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উগ্রমোহন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন না। বহ্নিকুমারী একা পড়িলেন। বহ্নিকুমারী অবশ্য চিরকালই একাকিনী। সাধারণতঃ জমিদার গৃহিণীগণ সখী-দাসী-পরিবৃতা হইয়া যে-জীবন যাপন করেন, বহ্নিকুমারী তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি বহ্নিকুমারীর মার্জিত মনের সূক্ষ্ম সুখদুঃখের অংশ লইতে পারেন। সখীবেশে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা সকলেই চাটুকার। বহ্নিকুমারী তাঁহাদের প্রশ্রয়

দিতেন, কারণ অপরের মুখে আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করা আভিজাত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু স্তাবককে তিনি অনুগ্রহই করিতে পারেন, তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় না, কারণ তাঁহারা নিম্নস্তরের জীব। বহ্নিকুমারীর মন যখন কাদম্বরীর সৌন্দর্যে অভিষিক্ত বা সাহানার সুরে মোহিত, তখন যাহারা আমসত্ত্ব বা ব্যঞ্জন-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে, তাহাদের প্রতি মৃদুহাস্যে কিছু অনুগ্রহ-বর্ষণ করা যাইতে পারে মাত্র, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা চলে না। মানসিক সমতা না থাকিলে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কিছুই জমে না। ইহাদের সহিত সখিত্ব করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বহ্নিকুমারীর ছিল না।

স্বামী উগ্রমোহন বহ্নিকুমারীর অবলম্বন, সঙ্গী নহেন। বিশাল মহীরুহ ব্রততীর সঙ্গী হইতে পারে না, আশ্রয় হইতে পারে। উগ্রমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বহ্নিকুমারী বাঁচিয়া ছিলেন। দুইজনের মধ্যে মিল কিছুমাত্র ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে অধিকাংশ সময় বুঝিতেও হয়তো পারিতেন না, কিন্তু তবু তাঁহাদের মিলনের বাধা ছিল না। মনের নিভৃত জগতে বহ্নিকুমারী পূজা করিতেন উগ্রমোহনকে নয়, উগ্রমোহনের শক্তিকে। উগ্রমোহনের এই শক্তি, এই মহিমা, এই প্রাবল্য বহ্নিকুমারীর দাম্পত্য-জীবনের মেরুদণ্ড। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বহ্নিকুমারীর সমস্ত সত্তা দাঁড়াইয়া ছিল, গঙ্গাগোবিন্দের বিরহে ভূমিসাৎ হইয়া যায় নাই। কিন্তু বহ্নিকুমারীর সঙ্গী কেহ ছিল না। বহ্নিকুমারী

চিরকালই একাকিনী—লেখাপড়া আর সঙ্গীত-চর্চা, প্রসাধন ও কারুশিল্প এই সব লইয়াই তাঁহার দিন কাটে। উগ্রমোহন সমস্ত দিন থাকেন অশ্বপৃষ্ঠে, সুতরাং বহ্নিকুমারী তাঁহার মধ্যে সঙ্গী খুঁজিয়া পান নাই। চন্দ্রকান্তের মত তিনিও আপনার কল্পলোকেই বাস করেন। তাঁহার কিশোর মনে গঙ্গাগোবিন্দের যে ছবি আঁকা হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও আছে। যুক্তির ঘর্ষণে তাহা খানিকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার চিত্তাকাশে গঙ্গাগোবিন্দ যেন ক্ষুদ্র একটি তারা, উগ্রমোহন যেন বিশাল একখানা মেঘ। তারা ক্ষুদ্র হউক, কিন্তু তাহা উজ্জ্বল। মেঘের দ্যুতি নাই, কিন্তু শোভা আছে, বিদ্যুৎ আছে, বজ্র আছে, সলিল-সম্ভারও আছে। তারা আকাশের এক প্রান্তেই স্থির হইয়া থাকে। মেঘ সমস্ত আকাশে নিমেষে আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেয়, ক্ষুদ্র নক্ষত্র ঢাকা পড়িয়া যায়। ঢাকা পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু নিবিয়া যায় না। মেঘ সরিয়া গেলে আবার তাহার উজ্জ্বল দীপ্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আজ প্রায় দশ দিন হইল উগ্রমোহন বৃন্দাবন গিয়াছেন।

বহ্নিকুমারীর একা একা আর ভাল লাগিল না। সন্ধ্যা হইয়াছে, শিবমন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিতেছে। নহবৎখানায় সানাই পূরবী ধরিয়াছে। আর একদিনের কথা মনে পড়িল।

বহ্নিকুমারী ডাকিলেন, কুসুম!

কুসুম নাম্নী দাসী আসিতেই তিনি আদেশ করিলেন, আমার পালকি তৈরি করতে বল্। একবার দাদার কাছে যাব।

২৬

চন্দ্রকান্ত তাঁহার খাস-কামরায় একা বসিয়া তাঁহার নব-নির্মিত একটি সেতারের আওয়াজ পরীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় বহ্নিকুমারীর পালকি আসিয়া থামিল। উগ্রমোহনের উর্দি-পরা সিপাহী আসিয়া সেলাম করিয়া খবর দিল যে, রাণীজী তাঁহার সহিত,সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত সেতার রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কে, বাণী এসেছে নাকি? কোথা?—বলিয়া তিনি বাহিরের দিকে আগাইয়া আসিলেন। সিপাহীরা সরিয়া গেল এবং বহ্নিকুমারী পালকি হইতে নামিয়া অগ্রজের পদধূলি লইলেন। চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, রাণী বহ্নিকুমারীর আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না যে! আয়, ভেতরে আয়।

ভ্রাতা-ভগ্নী ভিতরে গেলেন।

বহ্নিকুমারী ভিতরে গিয়াই বলিলেন, বাঃ, চমৎকার সেতারটা তো! কোথা থেকে আনলে দাদা?

তৈরি করালাম, এইখানেই। আওয়াজ মন্দ হয় নি।

বহ্নিকুমারী সেতারটা তুলিয়া লইয়া টুং-টাং আওয়াজ করিতে করিতে কহিলেন, বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে তো!

চন্দ্রকান্ত উপবেশন করিয়া বলিলেন, একটা কিছু বাজা দেখি। অনেক দিন তোর বাজনা শুনি নি।

বহ্নিকুমারী অগ্রজের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন, ভুলে গেছিস নাকি সব? আগে তো তুই আমার চেয়ে ভাল বাজাতিস। বাজা একখানা, শোনা যাক।

কি বাজাব?

যা তোর খুশি।

বহ্নিকুমারী সেতারটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন, তুমি যে সেই জৌনপুরি গৎটা আমায় দিয়েছিলে, সেইটে বাজাই। বাজাব?

এই সন্ধ্যেবেলা জৌনপুরি বাজাবি? আচ্ছা, বাজা।

বহ্নিকুমারী জৌনপুরি বাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বাজুবন্ধের দোলক দুলিতে লাগিল। কঙ্কণের শিঞ্জিতের সহিত সেতারের ঝঙ্কার মিলিয়া জৌনপুরি নূতন মূর্তি ধরিল, পুরুষ ওস্তাদের হাতে ইহা সম্ভব নয়। বহ্নিকুমারীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া চন্দ্রকান্তের মন অতীতে ফিরিয়া গেল। তখনও বাণী অনূঢ়া, নূতন সেতার বাজাইতে শিখিয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দকে বাজনা শুনাইবার জন্য তাহার কি আগ্রহ! নানা ফন্দিতে, নানা ছুতায় গঙ্গাগোবিন্দকে সেতার শুনাইয়া দিবার জন্য বাণী উন্মুখ হইয়া থাকিত। চন্দ্রকান্ত ইহা লইয়া বাণীকে কত বিদ্রূপই না করিয়াছেন।

বহ্নিকুমারী বাজনা শেষ করিয়া বলিলেন, উঃ, যা বড়

তোমার সেতার! হাত ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি একটা বাজাও দাদা এবার।

চন্দ্রকান্ত সেতার লইয়া বলিলেন, শুনেছিস, গঙ্গাগোবিন্দ কাল কাশী চ'লে যাচ্ছে?

হ্যাঁ। আমাকে চিঠি লিখেছিল একটা। কালই যাবে? এত তাড়াতাড়ি?

ওর মাথায় একটা খেয়াল ঢুকলে তো আর রক্ষে নেই। প্রাকৃত শিখবে ঝোঁক চেপেছিল, শিখে তবে ছেড়েছে। এখন সংস্কৃতের ভূত কাঁধে চেপেছে। দেখা যাক, কোথায় গিয়ে থামে!—বলিয়া চন্দ্রকান্ত সেতারের সুর মিলাইতে লাগিলেন। মিলাইতে মিলাইতে বলিলেন, আমার আবার এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে, কেউ ঠেকা না দিলে ভাল বাজাতে পারি না। তুই ঠেকা দিতে পারবি?

না, আমি পারব না।—বলিয়া বহ্নিকুমারী একটু হাসিলেন। আচ্ছা, তবে এমনিই শোন্। একখানা হাম্বীর বাজাই।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত শুরু করিলেন। বহ্নিকুমারী বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। বহুকাল দাদার বাজনা শোনা হয় নাই। চমৎকার হাত হইয়াছে তো! বহ্নিকুমারীর মনও অতীতে ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধ ওস্তাদ আবিদ মিঞাকে মনে পড়িল। বুড়ার হাত কি মিঠা ছিল! আবিদ মিঞার কাছে বাণীর প্রথম হাতেখড়ি। প্রথম প্রথম মেজ্‌রাপে আঙুলে কত লাগিত, তারে হাত কাটিয়া যাইত। ছাতের ঘরটাতে একা বসিয়া সেই ডা-রা-ডা-রা সাধা। তাহার পর ক্রমশ দুই-একটা

গৎ। গঙ্গাগোবিন্দকে ডাকিয়া গৎ শোনানো। গঙ্গাগোবিন্দ কাল চলিয়া যাইতেছে। বহ্নিকুমারী অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। চন্দ্রকান্তের সেতার থামিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন লাগল হাম্বীর?

বেশ।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উঠিলেন।

এঃ, তুই সব ভুলে গেছিস দেখছি। হাম্বীর বললাম ব'লেই হাম্বীর? কেদারা, ধরতে পারলি না? এই দেখ্।—বলিয়া আবার একটু বাজাইলেন। বহ্নিকুমারী যে গঙ্গাগোবিন্দের কথা ভাবিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন, অনেক দিন চর্চা নেই।

বাহিরে পদশব্দ হইল।

চন্দ্রকান্ত আছ নাকি? আসতে পারি?—বলিয়া গঙ্গা-গোবিন্দই ঘরে ঢুকিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, এ কি, বাণীও যে এখানে! আমি কাল ভোরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছিলাম।

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া পড়িবেন, বহ্নিকুমারী তাহা কল্পনাও করেন নাই। হঠাৎ তাঁহার মুখটা ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, কাল সত্যিই যাবে তা হ'লে?

হ্যাঁ। দেরি ক'রে লাভ কি? স্বল্প তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। বৃন্দাবন থেকে কোনও খবর এল?

না।

কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপচাপ।

গঙ্গাগোবিন্দই প্রথমে কথা বলিলেন, মনে রেখো তোমরা। নানা ভাবে অনেক বিরক্ত করেছি তোমাদের।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, দেখ, বিনয় প্রকাশের স্থান-অস্থান আছে। সেটা ভুলে যাও কেন? সংস্কৃত পড়তে যাচ্ছ ব'লে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

বহ্নিকুমারী কিছু না বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, গ্রাম ছাড়বার সময় বুঝতে পারছি, গ্রামের সঙ্গে সত্যিই একটা নাড়ীর যোগ আছে।

চন্দ্রকান্ত কহিলেন, তোমার মেয়ে-জামাইদের সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছ? কি বল্লে তারা?

বিশেষ কিছু নয়। বিয়ে হ'লেই মেয়েরা পর হয়ে যায়। বাণী যেমন আমাদের পর হয়ে গেছে।

বহ্নিকুমারীর মনে যে উত্তরটা আসিয়াছিল, তাহা না বলিয়া তিনি বলিলেন, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বটে, সত্যিই পর হয়ে গেছি এবং পরস্পর।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, এইবার উঠি আমি। আমাকে আবার একটু গোছগাছ করতে হবে।—বলিয়া তিনি সত্য-সত্যই উঠিয়া পড়িলেন। অতি সাধারণ কথাবার্তার ভিতর দিয়া বিদায়ের পালা শেষ হইয়া গেল। যাইবার সময় তিনি বলিলেন, ওহে, তোমার ম্যানেজার অনেকক্ষণ থেকে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই নাকি? আচ্ছা, বসুক।

বহ্নিকুমারী বলিলেন, তার দরকার কি? আমি ততক্ষণ পাশের ঘরে গিয়ে তোমার বই-টইগুলো একটু দেখি।

আচ্ছা, তা হ'লে ডেকে দিয়ে যাও।

গঙ্গাগোবিন্দ চলিয়া গেলেন এবং বহ্নিকুমারী উঠিয়া চন্দ্রকান্তের পুস্তকাগারে প্রবেশ করিলেন।

২৭

কমলাক্ষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও খবর পেলে?

আজ্ঞে না।

না মানে? মানিক মণ্ডলের খবর তা হ'লে ভুল?

খবর ভুল নয়। সে শুনে এসেছিল যে, উগ্রমোহনবাবু গোলোক সাকে যম-ঘরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন; অথচ যম-ঘর নামে যে ঘর যম-জঙ্গলে আছে, তার ভেতরকার খবর নেওয়া শক্ত—একপ্রকার অসম্ভব।

কেন?

সে ঘরে একটা লোহার দ্বার আছে এবং তা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ঘরে একটাও জানলা নেই। ঘরের দেওয়াল অত্যন্ত উঁচু। সুতরাং গোপনে সে ঘরের সম্বন্ধে কোন খবর সংগ্রহ করা শক্ত। অথচ মানিক মণ্ডলের খবর, সেই ঘরের মধ্যেই গোলোক সা আছে। আজ প্রায় দশ দিন অতীত হয়ে গেল, কোন খবরই যোগাড় করতে পারলাম না।

চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অঘোর চক্রবর্তী কোথা?

তাঁর কাছে রামদীন সিপাহীর মারফৎ একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলাম যে, যম-ঘরের অনুরূপ একটি ঘর টাল-জঙ্গলে করাবেন ব'লে বাবুর ইচ্ছে হয়েছে, আপনি যদি যম-ঘরটা খুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তা হ'লে আমরা ভেতরের মাপ-জোপ নিতে পারি।

কি উত্তর দিলেন তিনি?

তিনি বললেন যে, যম-ঘরের চাবি মালিকের কাছে আছে। তিনি বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে সে ব্যবস্থা হবে।

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর কমলাক্ষকেই বলিলেন, তা হ'লে এখন কি করা উচিত?

কমলাক্ষ ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে চাহিতে বলিলেন, পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় দেখি না।

পুলিসে খবর দেবে?—বলিয়া চন্দ্রকান্ত আবার খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন।—পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ভেবে পাচ্ছ না?

আজ্ঞে না। আমার মনে হচ্ছে, গোলক সাকে আমরা যদি দু-একদিনের মধ্যে উদ্ধার না করতে পারি, তা হ'লে সে বাঁচবে না।

বল কি?

আমার তো সেই রকমই মনে হয়। উগ্রমোহনবাবু তাকে মেরেছেন প্রচুর, তার ওপর আজ দশ দিন ধ'রে সে ওই

যম-ঘরে বন্দী অবস্থায় আছে। এক ফোঁটা জল বা এক দানা খাবার তার পেটে পড়ে নি।

কি ক'রে জানলে তুমি ?

যম-জঙ্গলে লুকিয়ে লোক মোতায়েন রেখেছিলাম যম-ঘরের ওপর নজর রাখবার জন্যে। দিবারাত্র একজন লোক সেখানে ছিল। আজ থেকে অবশ্য আর নেই। বলিয়া কমলাক্ষ আবার ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে লাগিলেন।

যম-ঘরে গোলোক সা আছে, এ খবর ঠিক তো ?

মানিক মণ্ডলের তাই খবর। উগ্রমোহনবাবু এই হুকুম দিয়েছিলেন সে স্বকর্ণে শুনেছে।

চন্দ্রকান্ত নীরবে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে একটি কথাই প্রবলভাবে জাগিতে লাগিল যে, বিলম্ব করিলে গোলোক সার মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে, এবং মৃত্যু যদি হয়, তাহার জন্য দায়ী তিনি। সুতরাং বিলম্ব করা অনুচিত। পুলিসে খবর দেওয়াটা যদিও তাঁহার মনপূত হইতেছিল না, তথাপি তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন, আচ্ছা যা ভাল বোঝ, তাই কর তা হ'লে।

কমলাক্ষ নমস্কার করিয়া বিদায় লইতেই গঙ্গাগোবিন্দ আবার ফিরিয়া আসিলেন।—ওহে, মল্লিনাথের টীকা তোমার আছে ? ও কি, তুমি অমন ক'রে ব'সে আছ কেন ?

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, মহাবীর উগ্রমোহনের প্রতাপে অস্থির হয়ে গেলাম।

কি রকম ?

গোলোক সাকে কোথা এক যম-ঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে আজ দশ দিন। লোকটা অনাহারে সেখানে শুকিয়ে মরছে।

গঙ্গাগোবিন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, সিংহ যে, বীরত্ব দেখাবেন বইকি। মল্লিনাথের টীকা আছে তোমার?

ছিল তো সবই। খুঁজে দেখে কাল পাঠিয়ে দেব। গোলোক সার ব্যাপারে মনটা বড় দ'মে আছে এখন।

গঙ্গাগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাণী চ'লে গেল কখন? বাণীর জন্যে ভারি কষ্ট হয়। উগ্রমোহনের মত লোকের সহধর্মিণী হওয়া নিশ্চয়ই সুখের নয় ওর পক্ষে।

চন্দ্রকান্ত একটু চোখ টিপিয়া বলিলেন, চুপ কর। পাশের ঘরেই আছে।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, তাই নাকি? শুনতে পায় নি বোধ হয়। আচ্ছা, আমি চললাম। মল্লিনাথটা খুঁজে দেখো।

পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া বহ্নিকুমারী সমস্ত শুনিয়াছিলেন। কমলাক্ষের কাহিনী, চন্দ্রকান্তের উক্তি ও গঙ্গাগোবিন্দের মন্তব্য, কিছুই বাদ যায় নাই। তাঁহার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, ধরণী, দ্বিধা হও। স্বামীর নিন্দা আর শুনিতে পারি না। রাগে, ক্ষোভে, লজ্জায় তাঁহার মনের যে অবর্ণনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহার আভাস তাঁহার মুখেও যে ফোটে নাই, তাহা নহে। তাঁহার পাতলা ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল। গঙ্গাগোবিন্দ যখন তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি করিলেন,

তখন তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল যে, বাহির হইয়া আসিয়া মুখের মতন একটা জবাব দেন। কিন্তু তাহাতে উগ্রমোহন সিংহের পত্নীর সম্মান-লাঘব হইবে—এই আশঙ্কায় তিনি তাহা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ পুড়িয়া যাইতেছিল। যম-ঘর? যম-জঙ্গল কাছারিতে বনভোজন উপলক্ষ্যে গিয়া তিনি যম-জঙ্গল দেখিয়াছিলেন বটে। তখনও তাহাতে তালা লাগানো ছিল। সে তালার চাবিও বোধ হয় বহ্নিকুমারী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। উগ্রমোহন সিংহের একটা দেরাজের মধ্যে যে চাবির গোছা আছে, তাহার মধ্যে একটা বড় চাবির গায়ে একটা কাগজ আঁটা আছে বটে—যম-ঘর।

চন্দ্রকান্ত ডাকিলেন, বাণী এখানে খেয়ে যাবি নাকি?

যেন কিছু হয় নাই, এই ভাবে হাসিয়া বহ্নিকুমারী বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, না। আমি এখনই চললাম। আমি তোমার এই বইটা নিয়ে চললাম! সাদীর অনুবাদ।

আচ্ছা।

বহ্নিকুমারী চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বহ্নিকুমারীর পালকি চন্দ্রকান্তের বাড়ির সীমানা ছাড়াইতেই বহ্নিকুমারী আদেশ দিলেন, গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ি চল! গঙ্গাগোবিন্দ আহারাদি শেষ করিয়া শুইবার যোগাড় করিতেছিলেন, এমন সময় বহ্নিকুমারীর পালকি তাঁহার দ্বারে থামিল। উর্দি-পরা সিপাহী ভিতরে গিয়া নিবেদন করিল, রাণীজী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বিস্মিত হইলেন। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, এস, বাণী, এস। কি খবর? এলে যে আবার?

বহ্নিকুমারী নামিয়া ভিতরে গেলেন এবং সংক্ষেপে বলিলেন, তোমায় প্রণাম করতে এলাম। তখন ভুলে গিয়েছিলাম। মুখে বিচিত্র হাসি।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, সে কি?

আর দেখা তো না হতে পারে।—বলিয়া বহ্নিকুমারী গঙ্গাগোবিন্দের পদধূলি লইলেন।

বিস্মিত গঙ্গাগোবিন্দ সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহ্নিকুমারী আবার হাসিয়া বলিলেন, আর একটা ভুলও তোমার ভেঙে দিতে এলাম। আমার স্বামী আমার গর্বের বস্তু। তাঁকে পেয়ে আমি যে শুধু সুখী হয়েছি তা নয়, ধন্য হয়েছি। দাদার কাছে তাঁর সম্বন্ধে যা শুনে এলে, তা সমস্ত মিথ্যে কথা। পুলিস গিয়ে কাল সকালেই বুঝতে পারবে যে, গোলোক সাকে সেখানে আটকে রাখা হয় নি, ওটা অল্পবুদ্ধি কমলাক্ষবাবুর বানানো গল্প। তুমি তো কাল থাকবে না, তোমাকে তাই জানিয়ে দিলাম। কাউকে ব'লো না যেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, না না, আমি কাউকে কিছু বলব না। দরকার কি আমার?

বহ্নিকুমারীর চক্ষে একটা বিদ্যুৎ-দীপ্তি খেলিয়া গেল। তিনি আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, চললাম তা হ'লে।—বলিয়া দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাহার পর ফিরিয়া বলিলেন, আমার একটা কথা রাখবে?

কি কথা ?

কিছুই নয়, শুধু মনে রেখো যে, মানব-জন্মটা শুধু মহত্ত্ব আস্ফালন করবার জন্যেই আমরা পাই নি। দেবতাই পাথরের হয়, মানুষের মধ্যে রক্তমাংসের দুর্বলতা থাকা সব সময় দোষের নয়। মনে রেখো কথাটা। চললাম।—বলিয়া বহ্নিকুমারী বাহিরে গিয়ে একেবারে পালকিতে উঠিয়া বসিলেন। নির্বাক গঙ্গাগোবিন্দ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহ্নিকুমারীর পালকি চলিয়াছে

যদি কেহ তখন পালকির দরজা খুলিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, রাণী বহ্নিকুমারী উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন।

২৮

যখন সকলে চলিয়া গেল, তখন চন্দ্রকান্ত নিতান্ত নিঃসঙ্গ-ভাবে একা বসিয়া রহিলেন। রাণী আজ রাত্রে এখানে খাইয়া গেলে ক্ষতি ছিল কি ? কিন্তু তিনি থাকিলেন না। থাকিবেনই বা কেন ? রাণী তাঁহার কে ? তাঁহার সহিত কতটুকু অন্তরঙ্গতা চন্দ্রকান্তের আছে ? কিছুই তো নাই। রক্তের সম্পর্ক অবশ্যই আছে, তাঁহারা ভাই-বোন। কিন্তু আত্মার সম্পর্ক তো নাই। একই মাতৃগর্ভে তাঁহারা জন্মলাভ করিয়াছেন, শৈশবে একসঙ্গে কিছুকাল কাটিয়াছে, কিন্তু ওই

পর্যন্ত। বিবাহের পর বাণী বহ্নিকুমারী হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রকান্তও নিজের খুশিমত নিজের জীবন যাপন করিয়াছেন। নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। বুধের সহিত নেপ্‌চুনের এখন আর কোন সম্পর্ক নাই; যেটুকু আছে, তাহা নিতান্তই বাহ্যিক। অন্তরঙ্গতার লেশমাত্র নাই; যাহা আছে তাহা স্মৃতি, জীবন্ত কিছু নয়।

গঙ্গাগোবিন্দও ছাড়িয়া চলিলেন। সকলেই একে একে চন্দ্রকান্তকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। অথচ সমস্ত জীবনটাই তো এখনও বাকি। এখনও যৌবন শেষ হয় নাই। এই দীর্ঘ জীবন একাই যাপন করিতে হইবে নাকি?

থাকিবার মধ্যে আছেন এক উগ্রমোহন। বাণীর অপেক্ষা উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের বেশি আত্মীয়। এই উগ্রমোহনকে কেন্দ্র করিয়াই চন্দ্রকান্তের সমস্ত জীবনটা আবর্তিত হইতেছে। চন্দ্রকান্তের আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ সমস্তই উগ্রমোহনকে অবলম্বন করিয়া। উগ্রমোহনের সহিত অহরহ সংঘর্ষে তাঁহার বুদ্ধি, শক্তি ও অর্থ সার্থক হইয়াছে। উগ্রমোহন না থাকিলে চন্দ্রকান্ত করিতেন কি? উগ্রমোহন কয়েকদিন হইল বৃন্দাবন গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন কে জানে! উগ্রমোহনের বিরহে চন্দ্রকান্ত মনে মনে পীড়িত হইতেছিলেন। তাঁহার সহিত আবার বসিয়া দাবা না খেলা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না। কবে ফিরিবেন তিনি?

একটা কথা সহসা বিদ্যুৎঝলকের মত চন্দ্রকান্তের মনে

ঝলসিয়া উঠিল। কমলাক্ষকে তো তিনি থানায় নালিশ করিবার হুকুম দিয়া দিলেন; কিন্তু ইহার ফল যে কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহা তো তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই।

গোলোক সা যদি সত্যই মরিয়া গিয়া থাকে এবং যম-ঘরে সেই মৃতদেহ যদি পাওয়া যায়! তাহা হইলে আইনের চক্ষে উগ্রমোহন খুনী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন তো। খুনীর শাস্তি যে ফাঁসি! উগ্রমোহনের ফাঁসি হইবে? চন্দ্রকান্তের চক্রান্তে? অসম্ভব। কিছুতেই তাহা হইতে পারে না।

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া পড়িলেন। মূর্খের মত এ কি করিয়া বসিয়াছেন তিনি? তাঁহার জীবনের একমাত্র বন্ধনটি ছিন্ন করিবার আয়োজন করিলেন তিনি কি বলিয়া? কমলাক্ষ কি থানায় গিয়াছেন?

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিল।

ম্যানেজারবাবু আছেন কি না দেখ্ তো।

ভজনা চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। গভীর আঁধারে একটু যেন আলোর রেখা দেখা দিল। তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন উগ্রমোহন সিংহকে, যেমন করিয়া হউক, বাঁচাইতে হইবে।

উগ্রমোহন-বিহীন চন্দ্রকান্তের অস্তিত্ব একান্ত শূন্য ও একান্ত নিরর্থক।

একটু পরেই কমলাক্ষবাবু আসিয়া নমস্কার করিলেন।

আমাকে ডেকেছেন আপনি ?

হ্যাঁ। থানায় খবর দিয়েছ না কি ?

হ্যাঁ, এইমাত্র তো দিয়ে এলাম।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তা হ'লে এখুনি একবার থানায় যাও আবার। যম-জঙ্গল খোঁজবার আর দরকার নেই। গোলোক সা এখনই এসেছিল আমার কাছে। এইমাত্র গেল। উগ্রমোহন তাকে মারধোর ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল। তোমার মানিক মণ্ডলের খবর ভুল।

সমস্ত পৃথিবীটা উল্টাইয়া গেলেও বোধ করি কমলাক্ষ সরকার এত আশ্চর্য হইতেন না। তিনি নির্বাক বিস্ময়ে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, যাও তা হ'লে, আর দেরি ক'রো না।

কমলাক্ষ চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত একাকী দীর্ঘ বারান্দাটার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

একটু পরে কমলাক্ষ আসিয়া বলিলেন, দারোগাবাবু বললেন যে, গোলোক সা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যায় একবার। কেসটা তিনি ডায়েরিতে টুকে ফেলেছেন কিনা।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, আচ্ছা। কটা বেজেছে বল তো ?

কমলাক্ষ বলিলেন, তা প্রায় এগারোটা হবে।

এখুনি হাতী কষতে বল। কলকাতা যাব আজ রাত্রে। ট্রেন তো রাত দেড়টায় ?

বিস্মিত কমলাক্ষ শুধু বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গোলক সার যমজ ভাইয়ের সন্ধানে চন্দ্রকান্ত সেই দিনই কলিকাতা রওনা হইলেন। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন।

২৯

সেই দিনই রাত্রে অঘোরবাবুও খবর পাইলেন যে, চন্দ্রকান্তবাবুর ম্যানেজার দুই-দুইবার থানায় গিয়াছেন এবং দারোগাবাবুর সহিত গোপনে কি সব পরামর্শ করিয়াছেন। সেই দিন রাত্রেই কোন রহস্যময় উপায়ে কমলাক্ষের নালিশের মর্মটিও অঘোরবাবুর কর্ণগোচর হইল। নালিশের মর্ম এই যে, জমিদার উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাদের আশ্রিত প্রজা গোলোকচন্দ্র সাহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং যম-জঙ্গলের যম-ঘরে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। পুলিস অবিলম্বে সাহায্য না করিলে গোলোক সাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে। পরদিন যম-জঙ্গল ঘেরাও করিয়া যম-ঘর খানাতল্লাশি করা হইবে, এ খবরও অঘোরবাবু পাইলেন। কিন্তু কমলাক্ষবাবু দ্বিতীয় বার থানায় গমন করিয়া যে খানাতল্লাশি বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন, এ খবরটুকু অঘোরবাবু পাইলেন না। সুতরাং তিনি যথারীতি সাবধান হইলেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, কালীপূজার পর দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে, সুতরাং পুলিস যম-ঘরে গিয়া বিশেষ কিছু

সুবিধা করিতে পারিবে না। যম-জঙ্গল কাছারিতে ভিখন তেওয়ারী আছে। পুলিস গিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে পারে এবং পুলিসের চাপে ভিখন তেওয়ারী হয়তো ভিতরের কথা প্রকাশ করিয়াও দিতে পারে। ভিখন তেওয়ারী লোকটির উপর অঘোরবাবুর তাদৃশ আস্থা নাই। কিন্তু যেহেতু সে লোকটি কুস্তি করিতে পারে, মালিকের সেজন্য তাহার উপর অসীম অনুগ্রহ।

পুলিস যখন সেখানে যাইবে, তখন ভিখন তেওয়ারীর সেখানে থাকিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

তাহাকে যম-জঙ্গল হইতে সরাইয়া দেওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া অঘোরবাবু একটি সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন যে, ভিখন তেওয়ারী যম-জঙ্গল কাছারিতে তালা লাগাইয়া দিয়া অবিলম্বে যেন সদরে চলিয়া আসে। যম-জঙ্গলে কাহারও থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই ব্যবস্থা করিয়া অঘোরবাবু ভাবিতে লাগিলেন যে, এখন তাঁহার থানার দারোগার সহিত দেখা করা সমীচীন হইবে কি না। ভাবিতেছিলেন, এমন সময় হাবেলির জমাদার আসিয়া সেলাম করিয়া নিবেদন করিল যে, রাণীজী তাঁহার সহিত কথা কহিতে চান।

রাণীজী?

হাঁ, হুজুর।

বল গিয়ে, আসছি এখনই।

অঘোরবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন। রাণীজী সহসা তাঁহার সহিত কি কথা বলিবেন এত রাত্রে!

পরদার অন্তরাল হইতে বহ্নিকুমারী প্রশ্ন করিলেন, যম-জঙ্গলের যম-ঘর সম্বন্ধে খবরটা আপনি শুনেছেন ?

অঘোরবাবুর পাথরের মত মুখ আরও শক্ত হইয়া গেল। তিনি অবিকম্পিত স্বরে মিথ্যা কথা বলিলেন, না।

সেখানে গোলোক সা ব'লে একজন প্রজাকে আটকে রাখা হয়েছে নাকি ?

কই, না, শুনি নি তো কিছু।

চারিদিকে তা হ'লে যে রব উঠেছে—

অঘোরবাবু বলিলেন, মিথ্যে গুজব।

নারীজাতির নিকট, তা হউন না তিনি রাণী বহ্নিকুমারী, এসব গুহ্য ব্যাপার প্রকাশ করার কোন অর্থ হয় না, অঘোর চক্রবর্তী তাহা বুঝিতেন, এবং বুঝিতেন বলিয়াই বোধ হয় অসঙ্কোচে মিথ্যা কথাগুলি বলিয়া গেলেন। বহ্নিকুমারী আবার প্রশ্ন করিলেন, যম-জঙ্গলে কে আছে এখন ?

এখন কেউ নেই সেখানে। ভিখন তেওয়ারী ছিল, তাকেও ডেকে পাঠিয়েছি।

কেন ?

কাল সেখানে পুলিস যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বহ্নিকুমারী নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন এখন। নানা রকম গুজব আমার কানে এসেছিল ব'লে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

অঘোরবাবু বিদায় লইলেন।

বহ্নিকুমারী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাহা হইলে তিনি

যাহা শুনিয়াছেন, সব সত্য। তাঁহাদের ম্যানেজারও পুলিসের আগমনবার্তা শুনিয়াছেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। নির্দোষ হইলে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইত না। অঘোরবাবু মিথ্যা কথা বলিয়াও বহ্নিকুমারীকে ঠকাইতে পারেন নাই। গোলোক সা নিশ্চয়ই তাহা হইলে যম-ঘরে বন্দী আছে। এ বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না। পুলিসের আগমনবার্তা পাইয়া অঘোরবাবু হয়তো গোলোক সাকে ছাড়িয়াও দিয়াছেন কিংবা মালিকের হুকুম ব্যতীত হয়তো তিনি তাহাও পারিতেছেন না। বহ্নিকুমারী মনে মনে স্থির করিলেন, আমি নিজে গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব। উগ্রমোহন সিংহের পত্নী আমি। কাল সকালে পুলিস গিয়া দেখিবে, কেহ নাই। কমলাক্ষ ম্যানেজারের সমস্ত কৌশল পণ্ড হইয়া যাইবে। কথাটা যখন আমার কানে আসিয়াছে, তখন স্বামীর অপমান আমি কিছুতে হইতে দিব না। তাহা ছাড়া স্বামীর ক্রোধে পড়িয়া একটি নিরীহ লোক অনর্থক কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই তো উচিত। গোলোক সাকে যদি যম-ঘরে পুলিসেরা পায়, তাহা হইলে উগ্রমোহনের শুধু যে পরাজয়, তাহা নয়,—ঘোরতর অসম্মান। শত্রু মিত্র সকলে হাসিবে। তাহা সহ্য করা বহ্নিকুমারীর পক্ষে অসম্ভব। নাঃ, নিজ হস্তে বহ্নিকুমারী ইহার প্রতিকার আজই করিবেন। বহ্নিকুমারী ডাকিলেন, কুসুম!

কুসুম আসিলে তিনি বলিলেন, বিহঙ্গিনীকে ডেকে দে তো। বিহঙ্গিনী বহ্নিকুমারীর সহচরী-প্রধানা। তাহার তীক্ষ্ণ

বুদ্ধির জন্য বহ্নিকুমারী তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বিহঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাতলা ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণা একটি যুবতী। চক্ষু দুইটি বেশ বড় বড়, হাসিতে ও বুদ্ধিতে সমুদ্ভাসিত। বহ্নিকুমারী বলিলেন, বিহঙ্গ, একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।

কি, বলুন?

আজ রাত্রে সবাই যখন ঘুমুবে, তখন পালকি ক'রে তুমি ও আমি একবার বেরুতে চাই। যম-জঙ্গলে যাব। লুকিয়ে যাব এবং লুকিয়ে ফিরে আসব। বাগানের দিকের খিড়কি-দরজাটা খুলে রেখো। পালকি-বেয়ারা খিড়কি-দরজার সামনে যে জামগাছটা আছে তারই তলায় যেন আমার অপেক্ষা করে। বাগানের ভেতর দিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেরিয়ে যেতে চাই। কথাটা গোপনীয়। বেয়ারাদের সে কথা ব'লে দিও।—বলিয়া বাক্স খুলিয়া কিছু অর্থ তিনি বিহঙ্গিনীকে দিলেন। বলিলেন, তোমার অনেক দিন থেকে পার্সী শাড়ির শখ। ওতেই হবে বোধ হয়। আর এই কটা টাকা বেয়ারাদের দিও।

বিহঙ্গিনী একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। রাণীজীর এই অদ্ভুত খেয়ালে মনে মনে একটু যে বিস্মিত হইল না, তাহা নয়। রাণীজীর নানারূপ বিচিত্র খেয়ালের সহিত অবশ্য তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু অদ্যকার এই নৈশ-অভিযানটা একটু বেশি রকম খাপছাড়া বলিয়া তাহার ঠেকিল। বিস্ময়কে সে অবশ্য মাত্রা ছাড়াইতে দিল না, কারণ হাতে অনেকগুলা

টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং রাণীজীর খেয়ালটা চরিতার্থ করিতে পারিলে একখানা বেনারসী শাড়ি বকশিশ পাওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং মনের বিস্ময় মনেই চাপিয়া বহ্নিকুমারীর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে সে তৎপর হইয়া উঠিল।

বহ্নিকুমারীর শয়নকক্ষে উগ্রমোহনের একটি তৈলচিত্র টাঙানো ছিল। নির্নিমেষনেত্রে বহ্নিকুমারী তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। গর্বিত উগ্রমোহন কোষনিবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অদম্য পুরুষসিংহ। বহ্নিকুমারী ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে বাগানের খিড়কিদ্বারে পালকি-বেহারা ও বিহঙ্গিনী অপেক্ষা করিতেছিল। বহ্নিকুমারী সন্তর্পণে গিয়া পালকিতে উঠিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ একখানি কালো শালে আপাদমস্তক ঢাকা।

পালকি নিঃশব্দে যম-জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করিল। শুক্লা-একাদশীর জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত।

যম-জঙ্গল কাছারিতে যখন বহ্নিকুমারীর পালকি পৌঁছিল তখন সেখানে কেহ নাই। শুক্লা-একাদশীর চন্দ্র পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। দুইটি 'চোখ গেল'-পাখী পাল্লা দিয়া সুর চড়াইয়া ডাকিতেছে। বহ্নিকুমারী পালকি হইতে অবতরণ করিলেন। বিহঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,

তোমরা এখানে থাক, আমি এখনই ফিরে আসছি। ঘটিটা আমাকে দাও।

একা যেতে ভয় করবে না আপনার? আমি না হয় আপনার সঙ্গে যাই।

কিছু দরকার হবে না। আমার মানত হচ্ছে যে, একা রাত্রে বাহিনীর জল নিয়ে সিংহবাহিনীর পূজো দেব।

পালকিতে আসিতে আসিতে বহ্নিকুমারী বিহঙ্গিনীকে একটি গল্প বানাইয়া বলিয়াছিলেন। গল্পটি এই যে, তিনি সন্তান-কামনায় সিংহবাহিনীর একদিন পূজা দিয়াছিলেন। তারপর স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, সিংহবাহিনী যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, একা রাত্রে বাহিনী-নদীর জল যম-জঙ্গল থেকে এনে যদি আমার পূজা করতে পারিস, তা হ'লে তোর কামনা সিদ্ধ হবে।

সুতরাং বিহঙ্গিনী আর কিছু বলিল না। বহ্নিকুমারী একাকিনী বনপথে চলিয়া গেলেন।

কিছুদূর গিয়া সত্যই কিন্তু তাঁহার ভয় করিতে লাগিল। যদিও বনের মধ্যে পথ আছে এবং জ্যোৎস্নায় পথ দেখিতে কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু বনের বিরাট গাম্ভীর্য বহ্নিকুমারীর মনে ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল।

পাশের একটা ঝোপের মধ্যে সরসর করিয়া কি যেন সরিয়া গেল। বহ্নিকুমারীর গাটা ছমছম করিয়া উঠিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি দেখিলেন, অল্প দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় কতকগুলি শৃগাল কোলাহল করিতেছে। তিনি

সেদিকে না গিয়া অন্য দিকে অগ্রসর হইলেন। যম-ঘরটা যে ঠিক কোথায় অবস্থিত, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। কিছুদিন আগে দিবালোকে একবার যম-ঘরটা তিনি দেখিয়াছিলেন। দেখিলে তিনি চিনিতে পারিবেন ; কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বনভূমির মধ্যে কোথায় যে ঘরটা আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। কিন্তু বাহির তিনি করিবেনই, তাঁহাকে করিতেই হইবে। যম-ঘরের চাবিটা তিনি শক্ত করিয়া হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া আরও খানিকটা দূর অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ আবার তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইল। কাহার যেন ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। শিশুর ক্রন্দন। বহ্নিকুমারীর বুকের ভিতরটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। একটু স্থির হইয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, শব্দটা সম্মুখবর্তী বৃহৎ দেবদারুবৃক্ষ হইতে আসিতেছে। তখন তাঁহার মনে পড়িল, কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন, শকুনি-শাবকরা ওইরূপ শব্দ করে বটে।

আবার তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। সামনের একটা ঝোপ পার হইয়া দেখিলেন যে, বাহিনী-নদীর তীরে আসিয়া পড়িয়াছেন। বাহিনীর দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিনী-নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া বিসর্পিত-গতিতে যম-জঙ্গলের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহার একটা বাঁকের মুখে একটা গাছ হেলিয়া নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে অসংখ্য খদ্যোত জ্বলিতেছে। যেন নক্ষত্রখচিত এক টুকরা অমাবস্যার আকাশ কেহ জ্যোৎস্নার

মধ্যে টাঙাইয়া দিয়াছে। বহ্নিকুমারী তাহার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

টি-ট্রি-হি—টি-ট্রি-হি—টি-ট্রি-হি—

একটি টিট্টিভ পক্ষী ডাকিয়া উঠিল। বহ্নিকুমারী চমকাইয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, যম-ঘর তো বাহিনীর তীরে নয়—যম-ঘর জঙ্গলের মধ্যে। বুঝিলেন, তিনি পথ ভুল করিয়াছেন। বাহিনীর তীর ত্যাগ করিয়া তিনি আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যম-ঘরে তাঁহাকে যাইতেই হইবে। গোলোক সা যদি সেখানে থাকে, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। গঙ্গাগোবিন্দকে কিছুতে বুঝিতে দেওয়া হইবে না যে, উগ্রমোহন সিংহ একটা নরঘাতক দস্যু।

বনের মধ্যে একাকিনী বহ্নিকুমারী চলিয়াছেন। চরণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ভয়ও তাঁহার আর করিতেছে না। যম-ঘরের চাবিটা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া নির্ভীক চিত্তে তিনি চলিয়াছেন।

বহ্নিকুমারী আর ফিরিলেন না।

যম-ঘরে দুইটি ময়াল সাপ ছিল।

গঙ্গাগোবিন্দ সংবাদটা যখন শুনিলেন, সহসা বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। বহ্নিকুমারী মরিয়াছেন? বহ্নি কি কখনও নেবে?

দ্বৈরথ বন্ধ হয় নাই।

আগে যেমন চলিতেছিল, এখনও তেমনই চলিতে লাগিল। উগ্রমোহন কেবল একটু বেশি গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তের সঙ্গীত চর্চা আর একটু যেন বাড়িয়াছিল। দাবা-খেলা থামে নাই। সবই পূর্বের মত চলিতেছিল। উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের সহিত বহ্নি-সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। কেবল একদিন একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গজটা আগাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, মন্ত্রী সামলাও।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া উগ্রমোহন খানিকক্ষণ দাবার ছকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা অপ্রাসঙ্গিকভাবে চন্দ্রকান্তকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ইমন আর পূরবীর তফাত ধর কি ক'রে তোমরা?

॥ শেষ ॥